যব খেত জাগে

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

Job Khet Jage

☐ প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন '৬৭ / সেপ্টেম্বর '৬০

☐ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

☐ মুদ্রণ : শ্রীনিমাই চন্দ্র ঘোষ। দি রঘুনাথ প্রিন্টার্স
৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৭০০০০৬

কৃষণ চন্দরকে বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের কাছে, বিশেষ করে প্রগতিশীল মহলের কাছে আর একবার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। পঞ্চাশ দশক থেকেই, অল্প হলেও বামপন্থী মহল কৃষণ চন্দর লেখার এবং নামের সঙ্গে পরিচিত।

'যব খেত জাগে' কৃষণ চন্দর এক অবিস্মরণীয় উপন্যাস। বিভিন্ন কারণেই এই উপন্যাস অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তার একটি প্রথম এবং প্রধান কারণ, তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ এই উপন্যাসের পটভূমি। আর যে পটভূমিকায় উঠে এসেছে রাঘব রাও-এর মতো এমন এক বিট্টি বা গোলাম, যে তার অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র এবং জীবন দিয়ে অনুভব করেছে বিপ্লবের মর্মবস্তু। যে মর্মবস্তু এই দীর্ঘ সংগ্রামের অন্তস্থলে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে ওঠে। এই উন্মোচনের ইতিহাস প্রোথিত হয়ে আছে এই সংগ্রামের সচেতন রাজনৈতিক অভিব্যক্তির মধ্যে। এই আন্দোলনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কৃষক অংশ গ্রহণ করেছে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে। আর যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে ছিল বিট্টি বা গোলামরা, আর ছিল জঙ্গলের যাযাবর আদিবাসীরা।

কৃষকদের এই মহান এবং ঐতিহাসিক সংগ্রাম ব্যাপক সশস্ত্র রূপ ধারণ করে অন্ধ্র মহাসভার নেতৃত্বে, যে অন্ধ্র মহাসভার অধিকাংশ নেতৃত্ব ছিলেন কমিউনিস্টরা। যাঁরা অত্যন্ত সততা নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের মহান ব্রতে ছিলেন উদ্দীপ্ত।

হাজার হাজার গ্রামে কৃষকরা নিজেদের রক্ষা এবং শত্রুকে প্রতিরোধ করার জন্যে নিয়মিত সেনাবাহিনী এবং গেরিলা ইউনিট তৈরি করেন। তাঁরা অস্ত্র সংগ্রহ এবং ব্যবহার কীভাবে করতে হয় তা শেখেন। নিজামশাহীর ফৌজ এবং রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁরা অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। আর এই লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে কৃষকরা নতুন মানুষে রূপান্তরিত হন—যে নতুন মানুষ, নতুন চেতনা-সমৃদ্ধ আত্মবিশ্বাস এর আগে এমন প্রখরভাবে বোধ হয় আর কোনদিন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংগ্রামে অনুভূত হয়নি।

তাই দলে দলে কৃষকরা যখন গেরিলা ইউনিটে যোগ দেওয়ার জন্যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন, তখন তাঁরা শুধু মন্ত্রের মতো তা উচ্চারিত করেন না, নিজেদের

জীবন ও গভীর সত্তা দিয়ে তা পূরণ করেন। কৃষকদের এই উদ্দীপ্ত প্রতিজ্ঞাকে আমি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না :

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি গেরিলা বাহিনীতে ভর্তি হচ্ছি। আর আমি দৃঢ়তার সঙ্গে শোষক এবং শাসক শ্রেণীকে ধ্বংস করার জন্যে এবং জনতার রাষ্ট্র-শক্তি কায়েম করার জন্যে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হচ্ছি। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই, শত্রুকে ধ্বংস করা এবং জনগণের সহায়তা করা আমার একান্ত কর্তব্য। অস্ত্র হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। অস্ত্র সংগ্রহ এবং অস্ত্র রক্ষা-করার জন্যে আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। কোনদিনই আমি ভয়ে পিছ-পা হব না, দুশমনের কাছে আত্মসমর্পণ করব না। বরং শহীদের মৃত্যুবরণ করব। আমি লাল ঝাণ্ডার সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রতিজ্ঞা করছি।'

এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত কৃষক গেরিলারা প্রায় তিন হাজার গ্রামকে শাসক ও শোষক শ্রেণীর হাত থেকে মুক্ত করেন। মুক্ত করে গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। আর এই গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যে চার হাজারেরও বেশী পার্টি কর্মী ও কৃষকরা শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

'অজন্তার অভিমুখে' এই দীর্ঘ বিস্মৃত প্রায় গল্পটি এই গ্রন্থে আমি সংযোজিত করলাম। কেন সংযোজিত করলাম তা পাঠকরা গল্পটি পড়লেই অনুভব করতে পারবেন।

দক্ষিণের বিশাল অঞ্চল জুড়ে সে সময় যে কৃষক জাগরণ শুরু হয়, তার পূর্বাভাসই শুধু এই গল্পে আসেনি, সঙ্গে সঙ্গে এসেছে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও নির্যাতন—যে শোষণ এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষণ চন্দর এক অনবদ্য ভঙ্গিতে তাঁর কলমকে এক যোদ্ধার ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। এবং স্বয়ং যোদ্ধা হয়ে উঠেছেন।

'যব খেত জাগে' এবং 'অজন্তার অভিমুখে' তাই এক এবং অভিন্ন হয়ে উঠেছে।

কমলেশ সেন

উৎসর্গ

কালের সীমারেখাকে অতিক্রম করে যে তিনজন গণশিল্পীর সৃষ্টি আমাদের মধ্যে এখনও দ্যোতনা সৃষ্টি করে—আমাদের আশা ও আকাঙ্খাকে উজ্জীবিত করে তোলে, সেই সুর ও ছন্দের স্রষ্টা সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং শম্ভু ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে

আমাদের প্রকাশিত আরো অনুবাদ-গ্রন্থ

শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার / অমৃতা প্রীতম ২০·০০

নগ্নসত্তা / কমলা দাস ১৮·০০

পঞ্চপ্রিয়া / অসিত সরকার সম্পাদিত ৩০·০০

সিক্রেট অ্যাডভারসারি / আগাথা ক্রিস্টি ১৮·০০

স্যাডোস ইন প্যারাডাইস / এরিখ মারিয়া রেমার্ক ২৫·০

কোকা কোলা / হাওয়ার্ড ফাস্ট ১৫·০০

এভরি নাইট জোসেফাইন / জ্যাকলীন সুশান ১৮·০০

সুখের কাঁটা / হ্যারল্ড রবিন্স ১৫·০০

স্বপ্ন সওদাগর / হ্যারল্ড রবিন্স ২৫·০০

সাক্ষী দু'চোখ / আগাথা ক্রিস্টি ও ডরোথি সেয়ার্স ২৫·০

গোল্ডেন রাঁদেভ্যু / অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন ১২·০০

দাঁড়ান ! অন্ধকার হোক / হেনরী স্লেজার ১০·০০

ছোটদের ড্রাকুলা / ব্রাম স্টোকার অনুসরণে ১০·০০

মৃত্যুর চোখ নীল / জন ল্যাণ্ড ১১·০০

এমমি / ভ্লাদিমির নবোকভ ১২·০০

এক

রাঘব রাও-এর বয়স বাইশ। জেলখানায় আজ তার শেষ রাত। আগামীকাল ভোরে তাকে ফাঁসী দেয়া হয়ে।

জেলের অন্ধ কুঠরীতে শুয়ে শুয়ে রাঘব রাও তার ফেলে-আসা দিন-গুলির দিকে একবার ফিরে তাকাল—তার সমস্ত জীবনের ওপর একবার নিমেষে চোখ বোলালো। খুব সাবধানে সে তার স্বল্প পরিসর জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে এক এক করে গুনতে লাগল। কিসান যেমনটি ভাবে নগদ পাই-পয়সা থলিতে রাখার আগে ভালো করে উলটে-পালটে দেখে, ঠিক সেইরকম সাবধান সতর্কতা আর সংশয়ের ভাব নিয়ে রাঘব রাও তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উলটে-পালটে পরখ করতে লাগল। কারণ এই প্রতিটি পাই-পয়সা সে তার নিজের হাতে ছাঁচে ঢেলেছে। নিঃসন্দেহে তার জীবনের কিছু মুহূর্ত—কিছু ক্ষণ তার বাবা-মা দিয়েছে—যেমন তার জন্ম, মার কোল বাবার কাঁধ। আর কিছু মুহূর্ত সমাজের ট্যাকশালে পিষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু জীবনের এমন অনেক মুহূর্ত আছে—যে মুহূর্তগুলো সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে মূল্যবান এবং সুন্দর, তা সে নিজের হাতেই সৃষ্টি করেছে। আর সে তার আকাঙ্খা এবং শ্রম দিয়ে এই মুহূর্তগুলোকে সুন্দর ছাঁচে ঢেলেছে। অর্থাৎ সে যেমন হয়েছে, যা কিছু ভেবেছে, যা কিছু করেছে, আর যে ভাবে ধীরে ধীরে সে বিকশিত হয়েছে—এ সব কিছুরই ওপর পরিপূর্ণভাবে তার নিজের ব্যক্তিত্বের গভীর ছাপা রয়েছে। এ সবের ওপর কোন দৈব বা অপ্রাকৃত শক্তির ছাপ নেই।

তবু প্রতিটি মানুষের জীবনের কিছু কানাকড়ি বা পাই-পয়সা ভালো থাকে আর কিছু অচল বেরিয়ে চায়। আর সেজন্যেই তা যাচাই করা—পরখ করা একান্ত প্রয়োজন। নিজের জন্যে না হোক,

অন্ততঃ অন্যের জন্যে তো যাচাই করা দরকার, কারণ তারাও তো আপনজন। রাঘব রাও-এর জীবনের মেয়াদ যদিও ফুরিয়ে এসেছে, তবু সে শেষবারের মতো নিজেকে বিশ্লেষণ করার জন্যে তার অতীতের দিকে ফিরে তাকাল, তার প্রশস্ত ললাটের ওপর চিন্তার গাঢ় রেখা ফুটে উঠল। তার পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি আর হাতে এটে বসেছে লোহার হাতকড়া। কিন্তু তার চিন্তা—তার কল্পনা সমস্ত দৈহিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে ফেলে-আসা মুহূর্তগুলোর যা কিছু সাচ্চা এবং ঝুটা তা পরখ করে দেখতে লাগল।

যারা রাঘাব রাও-এর মতো মানুষ নয়, তারা একে নিছক সময় কাটানোর অছিলা বলে মনে করবে। সময়কে যারা ভূমণ্ডলের চৌখাট এবং মানুষের প্রভু বলে মনে করে, রাও তেমন ধাতের মানুষ নয়। বহু সত্যানুসন্ধান করেই রাখব রাও এই দিব্য সত্যকে উপলব্ধি করেছে, মানুষ তার ইচ্ছানুসারেই সময়কে ছাঁচে ঢালে আর তাতে সে সময়ের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিশ্বকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে। রাঘব রাও তার সামান্য শক্তি এবং সামর্থ দিয়ে তা-ই করতে চেয়েছিল। তাতে সে কতটুকু সাফল্য আর কতটুকু ব্যর্থ হয়েছে, তা সে এখন—এই অন্তিম মুহূর্তে পরখ করতে চাইছে। তাই সে তার স্বল্প পরিসর জীবনের প্রতিটি পাই-পয়সাকে তার সামনে ছড়িয়ে দিয়েছে। ছড়িয়ে দিয়ে এক একটি করে পাই-পয়সাকে উঠিয়ে উঠিয়ে সে দেখতে লাগল।

এই ওর মা। ওর যখন তিন বছর বয়স, তখন ওর মা মারা যায়। মার একটা আবছা আলো-আঁধারি স্মৃতি শুধু রাও-এর মনে আছে। মনে পড়ে মার বড় বড় কালো টানা চোখ, বুকের কাঁচা দুধ, যে দুধ ওর ঠোঁটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত। আর নরম উষ্ণ কোল। আর মার বুকের ওপর হাত রেখে শুয়ে থাকা। শুধু এতটুকুই ওর মনে আছে। রাঘব রাও এই পয়সটাকে তুলে খুব আদরের সঙ্গে চুমু খেল। চুমু খেয়ে একপাশে সযত্নে সরিয়ে রাখল।

আর এই ওর বাবা বিরাইয়া। বিরাইয়া ওর মা ওর বাবা ওর বন্ধু ওর সাথীও। সে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাও-এর সঙ্গে লড়াই করেছে। আবার গুরুও। অনেক ব্যক্তিত্ব এসে বিরাইয়ার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছিল! সত্যি খুব সুন্দর হত, যদি রাখব রাও এইসব ব্যক্তিত্বকে আলাদা আলাদা এবং একক হিসেবে পেত। তাতে জীবন অনেক বেশী মধুর, অনেক বেশী গহীন এবং সৌন্দর্যে ভরে উঠত। আর অন্য কিছু পয়সা যদি সমাজ এবং পরিবেশের হত, তবে তা অবশ্যই—নিশ্চিত ভাবে জীবনের মুঠোয় অনায়াসে ঢেলে দেয়া যেত। জীবনের মুঠোয়-ধরা এই পয়সা মানুষ নিজের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার নিজের জীবনকেই সৃষ্টি করত। বিরাইয়া ছিল খেত মজুর—ভূমিদাস। তাকে বেগার খাটতে হত। সে এত গরীব যে, দ্বিতীয়-বার বিয়ে করারও তার সামর্থ ছিল না। ছেলেকে যে ইস্কুলে পাঠাবে, সে সামর্থও তার ছিল না। আর তাই বিরাইয়া তার ছেলের কাছে হয়ে উঠেছিল তার মা তার ইস্কুল—তার সাথী। এতে দোষের কী আছে!

রাও এই পয়সাটাকে,—যে পয়সার ওপর ওর বাবার মুখের মোহর ছিল, উলটে-পালটে পরখ করল। বিরাইয়ার দেহের গড়ন ছোটখাটো, কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট। মাথা থাকত কামানো। চোখ ছোটছোট—কুতকুতে। আর পা দুটো থাকত নগ্ন। নগ্ন পা দুটো ছিল যেমন মিশ কালো, তেমনি মজবুত—সুগঠিত। তার পায়ে জুতোর কোন প্রয়োজনই হত না। বড় হয়ে রাঘব রাও-এর পা দুটোও তার বাবার মতো দেখতে হয়েছিল। রাঘব রাও তার পা দুটোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু ডাণ্ডাবেড়ির জন্যে চোখ বোলাতে পারল না। সে একটু মৃদু হাসল।

বিরাইয়া ছোটবেলা থেকেই রাঘব রাওকে যেমন দৃঢ় তেমনি কষ্ট সহিষ্ণু করে তুলেছিল। কারণ সে ওকে ওর মায়ের মতো আদর-যত্ন করে লালন-পালন করতে পারেনি। কিন্তু যে মাকে খেতে কাজ করতে হয়, সে মা তার সন্তানকে যেমনটি ভাবে লালন-পালন করতে

চায়, ঠিক তেমন তেমনটি ভাবে লালন-পালন করতে পারে না।

বিরাইয়াকে তো সেই ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হত। কারণ তার নিজের জমিজমা বলতে কিছুই ছিল না। জমি ছিল জমিদারের, আর তারা ছিল জমিদারের জমিতে মজুর—ভূমিদাস। তারা ছিল জমিদারের গোয়ালা, কখনও তাদের টাট্টু ঘোড়া বা মুরগী—কখনও বা তাদের ঘরণী এবং মেয়ের দালালও। যে মানুষকে তার জীবন নির্বাহের জন্যে এত কিছু করতে হয়, সে যদি তার ছেলেকে কষ্ট সহিষ্ণু এবং পরিশ্রমী করে না তোলে, তবে বুঝতে হবে সে তার সন্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করেছে।

বিরাইয়া অন্য আর কিছু হতে পারে কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতক পিতা নয়। তাই ছেলেবেলা থেকে রাঘব রাও ক্ষুধা অনাহার আর নগ্ন পায়ে ঘুরেছে। আর এই ক্ষুধা অনাহার এবং নগ্ন অবস্থায় থেকেও জীবনের রসকসহীন—নীরস ক্ষণ থেকে কোন না কোনভাবে সামান্য রস কী ভাবে সঞ্চয় করতে হয় তা শিখে নিয়েছিল। এর বেশী তার আর কিছু চাহিদা ছিল না, থাকলেও সমাজের যে টংকা সে টংকা এত তিক্ত ছিল যে, আশা এবং আকাঙ্খার হাটে এর বেশী অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওর ঠিক মনে নেই, তবে একটা অস্পষ্ট আর আবছা ছবি মাঝে-মধ্যে ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যখন ও খুব ছোট, সেই সময় জানুয়ারীর সকালগুলিতে আরও বেশ ঘণ্টা কয়েক বিছানায় সটান পড়ে থাকতে ওর ইচ্ছে করত। কিন্তু ওর বাবা ওকে পিঠে বেঁধে নিয়ে জমিদারের তুলোর খেতে কাজ করার জন্যে চলে যেত। রাঘব রাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানে কেঁদে চলত। আর ওর বাবা ক্রন্দনরত শিশুকে পিঠে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘামে জবজবে হয়ে খেতের তুলো সংগ্রহ করে চলত। একসময় ও কান্না ভুলে চুপ করে যাওয়া শিখে গেল। দুধের বদলে ভাত এবং গুংগ-গোরা পাতার চাটনি খাওয়াও শিখে গেল। কী ভাবে রুটি তৈরি করতে হয় তাও একদিন শিখে ফেলল। খেতের কাজকর্ম শিখে না-নাওয়া পর্যন্ত, ও বাবার জন্যে রুটি বানাত। রুটি বানিয়ে খেতে নিয়ে যেত। রুটি

বানানো এমন কোন কঠিন কাজ ওর কাছে ছিল না। প্রথম প্রথম ও বজরার দানা চালের মতো জলে সিদ্ধ করে, তার সঙ্গে একটু চাটনি পিষে নিত। তারপর সে দুটি কলাপাতার মধ্যে তা বেঁধে বাবার জন্যে খেতে নিয়ে যেত। কখনও কখনও জমিদার বাড়ি থেকে তাদের জন্যে ঘোল পাঠিয়ে দিত। ঘোল আর চাটনি দিয়ে ভাত খেয়ে ক্লান্ত হাত দুটোতে আবার বল ফিরে আসত। তারপর বিরাইয়া খেতে ফসল কাটার কাজে লেগে যেত। আর রাঘব রাও কাটা ফসল একজায়গায় জড়ো করত। তারপর ধীরে ধীরে একদিন রাঘব রাও জানল বীজ বোনা আর ফসল তারা কাটলেও, এতে তাদের কোন অধিকার নেই। ও পুরোপুরি যেদিন খেতমজুরে পরিণত হল, সেদিন ওর শিক্ষারও সমাপ্তি ঘটল।

ভারবাহী গাধা মমতা আর স্নেহ নিয়ে নিজের ভারবাহী সন্তানের দিকে যেমন ভাবে তাকায়, ভূমিদাস বিরাইয়াও তেমনি অসাধারণ গর্বের সঙ্গে তার ভূমিদাস পুত্রের দিকে তাকাত। সন্তানের বোঝা কিছুটা লাঘব করাই হচ্ছে পিতৃস্নেহ, আর পিতার ঘাড় থেকে নিজের ঘাড়ে বোঝা টেনে নেয়ার মধ্যেই বোধ হয় আছে পুত্রের ভালো-বাসা। আর জমিদারের চিন্তা, কিভাবে সে ধীরে ধীরে দু'জনের কাঁধেই ঝোঝার ভার বাড়িয়ে তুলবে।

এই পয়সাটাকে রাঘব রাও আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। ওর বাবার সঙ্গে ওর কী সুন্দরই না মিল! বাবার আকৃতি, বাবার রঙ, বাবার দারিদ্র্য—সব কিছুই ও উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। সে তো আর তার রঙ এবং আকৃতি পালটাতে পারে না, আর তেমন কোন ইচ্ছেও তার ছিল না। কিন্তু নিজের দারিদ্র্যকে সে অবশ্যই হটাতে চেয়েছিল। এই যে আকাঙ্খা—এই আকাঙ্খা তার যৌবনে ব্যাকুল হয়ে ওঠেনি,—অনেক অনেক দিন আগে তার ছেলে বেলায় ব্যাকুল হয়ে উঠে। ব্যাকুল হয়ে ওঠে, যখন সে তার মতো ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ইস্কুলে যেতে দেখে। বই ইস্কুল আর ভালো কাপড়ের জন্যে—তা স্পর্শ করার জন্যে এবং

ভালোবাসার জন্যে এক প্রবল আকাঙ্খা তার মনের অবগহনে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিরাইয়া তাকে বুঝিয়ে দেয় তার এই আকাঙ্খা কোন দিনই সার্থক হয়ে উঠবে না। গোলামের সন্তান গোলামই হয়, যেমন জমিদারের সন্তান জমিদার, পুজারীর সন্তান পুজারীই হয়। তাই কোন কোন ছেলে-মেয়ে ইস্কুলে যায়, আর কোন কোন ছেলে-মেয়ে ফসল কাটে। এর মধ্যে অন্যায়ের কিছু নেই। হাজার হাজার বছর ধরে এমনই চলে আসছে। বিরাইয়ার কথা শুনে রাঘব রাও আর কোন কথা বলতে পারে না— চুপ হয়ে যায়। বাবা ভাবল, ছেলে তার মতোই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কি তাই-ই হয়েছিল?

রাঘব রাও এবার তার জীবনের আর একটি মুহূর্তকে উঠিয়ে নেয়। যখন তার বয়স বছর এগারো, সেই সময় তাদের গ্রাম শ্রীপুরমে একটা মেলা হয়। প্রতি দশ বৎসর অন্তর অন্তর এই মেলা তাদের গ্রামে বসে। নারকেল পাতায়-ছাওয়া শ্রীপুরমের প্রতিটি বাড়িতে তখন আনন্দ আর হাসির ঢেউ বয়ে যেত। বিরাইয়াও এই প্রথম তার সন্তানকে নতুন খদ্দরের ধুতি খদ্দরের জামা আর মাথায় খদ্দরের পাগড়ি পরাল। আর গলায় সাধুর কাছে পাওয়া লাল সুতোর এক মন্ত্রপুত তাবিজ ঝুলিয়ে দিল। সেদিন রাঘব রাও ভোগাবতী নদীতে স্নান করে আর ঝকমকে পোশাক পরে খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে। ঝটাপট ভাত আর পরওয়া খেয়ে নিয়ে সে তার বাবার সঙ্গে গ্রামের যে খোলামেলা প্রান্তরে মেলা বসে, সেদিকে রওনা হয়। মেলার পথে এখানে ওখানে গাছের নিচে ছেলেরা কাপাটি আর হা ডুডু খেলছিল। আর এক প্রাচীন বটগাছের নিচে ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা লুকোচুরি খেলছিল। যেখানে মেলা বসেছে, তার একটু দূরেই মণ্ডপের পাথুরে টিলা। যাযাবররা মেলাতে বাসন চুড়ি চিরুণী তেল আরও কত কি টুকিটাকি এনে পসার সাজিয়েছিল। তামাক এবং গুড়ও এসেছিল। ছেলেপুলেদের জন্যে ছিল মাটির খেলনা তালপাতার ঝুড়ি আর বুম্বে। আর ছিল জাপানী রেশমের

দোকান। সেই দোকানের সামনে রাঘব রাও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কাপড় এত খুবসুরত হতে পারে! এত মনলোভানো আর নরম! ওর এখনও মনে আছে, দোকানের সামনে গিয়ে ও রেশমের একটা থান আলতোভাবে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছিল। সত্যিই কি কাপড় মানুষের স্বপ্নের মতো এত নরম—তুলতুলে, এত উজ্জ্বল আর সুন্দর! তাই সে এক লহমার জন্যে হলেও স্পর্শ করে দেখেছিল। আর এত—এত বছর পরেও সেই স্পর্শ যেন এই অন্ধকার কুঠরীতে মোহরের মতো ঝনঝন—ঝনঝন করে বেজে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে রাঘব রাও-এর কানে এই সঙ্গীতময় ঝংকারের রেশ টুং টাং করে বেজে চলল।

ওর আবার মনে পড়ে গেল রামাইয়া চেট্টির ধমক। ধমকে বলেছিল, 'শালা গোলামের বাচ্চা হয়ে রেশমে হাত দেয়েছিস! শয়তান কোথাকার, গায়ের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেব।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ওর বাবা বিরাইয়া রেশমের থান থেকে এক ঝটকায় তার হাত সরিয়ে দেয়। সরিয়ে দিয়ে তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। রাঘব রাও কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে যায়। মনে হয়েছিল, জীবনের এই নগ্নতা বোধহয় শুধু তার একার জন্যেই। জীবনের যে রেশম, সেই রেশমের কোমলতা—তার ঔজ্জ্বল্য, এসব তার জন্যে নয়। রাঘব রাও তার হাতের তালুতে আর একটি অচল পয়সা তুলে নিয়ে পরখ করল, সে পয়সা সে তার আশা-আকাঙ্খার বাজারে কোনভাবেই এপিঠ-ওপিঠ করে চালাতে পারেনি! এই অচল পয়সার মালিক সে বা তার বাবা নয়। এই পয়সা তাদের পরিশ্রমেরও নয়। এই পয়সা সে পেয়েছিল সমাজের কাছে থেকে উপঢৌকন হিসেবে। হঠাৎ-ই রাঘব রাও-এর মন উদাস হয়ে গেল। বাবা ওকে ভোলাতে চেষ্টা করলেও, ও কিছুতেই ভুলে যেতে পারেনি। ভোলানের জন্যে বাবা ওকে দোলায় চড়াল, গুড়ের শরবৎ খাওয়াল। তাতে ওর আত্মা কিছুটা শান্ত হল সত্য, কিন্তু ওর মন পড়ে রইল রেশমের রঙিন কাপড়ের ওপর।

সন্ধ্যার সময় ওরা বাপ-বেটা যখন মেলা থেকে ফিরছিল, পথে প্যাটেলের পাইক এবং দুর্গায়ার সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল। দু'জনে চোখই নেশায় লাল। দু'জনের হাতেই পিস্তল। বাপ-বেটাকে দেখতে পেয়ে ওরা দু'জনে তাদের ঘিরে ফেলল। বিরাইয়া বলল, 'ভালো আছেন তো?'

দুর্গায়া বলল, 'সোজাসুজি যদি যাস, ভালো। নইলে···'

বিরাইয়া জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেতে হবে?'

'···সূর্যাপেটে যেতে হবে বেগার খাটতে। এখুনি যেতে হবে। জমিদার সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন।'

রাঘব রাও তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাবা, আজ তো মেলার দিন।'

ভিমাইয়া রাঘব রাও-এর গলা চেপে ধরে তার গালে এক চড় কশাল। চড় কশিয়ে পাগড়ি টেনে খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, আর তার নতুন জামা ফাতাফাতা করে ছিঁড়ে তার ধুতি খুলে নিয়ে উলঙ্গ করে দিল।

রাঘব রাও-ও রুখে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ভিমাইয়া বলবান, আর রাঘব রাও তখন এইটুকুন—বড্ড ছেলে মানুষ। ভিমাইয়া যখন রাঘব রাও-এর বুকের ওপর পিস্তল চেপে ধরল, তখন বিরাইয়া লাফিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরে কাকুতি-মিনতি করে বলল, 'মালিক এতো শিশু, ও তো জানে না আমি ভূমিদাস—হুজুরের বাঁধা গোলাম। জমজমাট মেলা থেকে জমিদার সাহাব যদি তলব পাঠান তাহলেও আমি চলে আসব।'

রাঘব রাও ক্রুদ্ধভাবে বলল, 'কেন যাব?'

'চুপ কর বলছি!' বিরাইয়া তার ছেলের মুখে এক ঘুষি মারল।

রাঘব রাও এর মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিরাইয়া আজ পর্যন্ত কোনদিন তার ছেলের গায়ে হাত তোলেনি। তাই রাঘব রাও অবাক হয়ে তার বাবার মুখের দিকে

চেয়ে রইল। ঠোঁট বেয়ে যে রক্ত ঝরছিল, তা সে মুছে ফেলার কোন চেষ্টাই করল না। কিন্তু রক্ত যখন থুতনি বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল, তখনও সে অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দৃষ্টি না নামিয়ে সে তার হাতের চেটো দিয়ে রক্ত মুছে নিল। আর অবশিষ্ট যে রক্তটুকু ঠোঁটে লেগে রইল, তা সে নিঃশব্দে চুষে নিল। কোন টু শব্দটিও সে করল না।

বিরাইয়া তার ছেলেকে খিস্তি দিয়ে ওদের বলল, 'মালিক আমি তো ভূমিদাস, মালিকের বেগার খাটব না, তা কি হতে পারে! আমার ছেলেও ভূমিদাস। ওকেও আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আমাদের ভূমিদাসদের মেলা-টেলা দিয়ে কি হবে?'

'এখন সিধে পথে এসেছে। শালা আবার নতুন কাপড় পরেছে!' ভিমাইয়া এগুতে এগুতে বলল।

দুর্গায়া রাঘব রাওকে ধাক্কা মেরে মেরে এগুতে লাগল।

বিরাইয়া হাত জোড় করে বলল, 'মালিক খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি বারন করেছিলাম, কিন্তু বদমাশটা কিছুতেই শুনল না। বারবার বলতে লাগল, আজ মেলা, নতুন কপড় পরব।'

'কেন বেটা তুই জানিস না, মালিকের সামনে কেউ নতুন কাপড় পরতে পারে না।'

'জানি মালিক।'

'তবে যে বড্ড পরেছিলি।'

'মালিক, কসুর মাফ কর। এমনটি আর হবে না!'

ভিমাইয়া বলল, 'সেজন্যেই আমি ওর কাপড় ফাতাফাতা করে ছিঁড়ে দিয়েছি। যাতে আর কখনো এ ভুল না করিস। গোলামকে গোলামের মতোই থাকা উচিত।'

ভিমাইয়া আর দুর্গায়া মেলা আর গ্রাম থেকে আরও পঞ্চাশ-ষাট জন গোলামকে একাট্টা করে তাদের ভেড়ার দলের মতো খেদিয়ে জমিদারের দেউড়ির দিকে নিয়ে চলল।

জমিদারের গড়টা বেশ উঁচু। গড়ের ফটকও তেমনি উঁচু। আর

এই গড়ের ভেতরই জমিদারের বাসগৃহ—যে বাসগৃহকে আজ পর্যন্ত গোলামরা স্বচোখে দেখেনি।

এই প্রথম রাঘব রাও গড় দেখল। অনেক—অনেক দূর থেকে ও গড় দেখেছে। দু-একবার সাহস করে গড়ের কাছে-পিঠে ঘুর ঘুর করে দেখেছে। দেখেছে শাস্ত্রীরা টহল দিচ্ছে। কিন্তু গড়ের অন্দরে ঢোকার সাহস কোনদিন ওর হয়নি। শিশু-মনে যে হাজারো প্রশ্ন এবং অনুসন্ধিৎসা, আজ পিটুনি এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেললেও, জমিদাব আর জমিদারের ঐশ্বর্যময় গড় সম্পর্কে একটা ভয়-ভয় ভাব থাকলেও, রাঘব রাও প্রচণ্ড উৎসুকতা নিয়ে গড়ের চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। হঠাৎ ওর বাবা ঘাড়ে একটা ঝাপট মেরে ঘাড় মাটির দিকে নিচু করে দিয়ে বলল, 'ওপরের দিকে তাকাস নে, পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে থাক, নইলে মালিক গোসা করবেন।'

রাঘব রাও দেখল, সত্যি, সমস্ত গোলামরা মাথা ঝুকিয়ে হাত জোড় করে পায়ের পাতার দিকে চোখ রেখে সারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে রাঘব রাও একটা কর্কশ কণ্ঠের হাঁক শুনতে পেল, 'দুর্গায়া।'

দুর্গায়া উত্তর দিল, 'জি মালিক।'

ভয়ে রাঘব রাও মাটি থেকে চোখ তুলতে পারল না।

'কত গোলাম নিয়ে এসেছিস?'

জী, 'দু' কম ষাটজন নিয়ে এসেছি, মালিক।'

'বেশ, বেশ, এতেই কাজ হয়ে যাবে। খাওয়া-দাওয়ার কিন্তু ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করে নিস। অনেক দূর পথ তো এদের যেতে হবে।'

ভিমাইয়া বলল, 'এরা সঙ্গে করে খাবার-দাবার এনেছে মালিক।'

বিরাইয়া মনে মনে বলল, ইস, কী নির্ভেজাল মিথ্যে কথাই না বলছে!

'বেশ বেশ, তবে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে যা।' আবার সেই কর্কশ কণ্ঠ গম গম করে উঠল।

দুই

ভিমাইয়া এবং দুর্গায়া উলটো-কদমে গোলামদের হাটিয়ে গড়ের বইরে নিয়ে এল। নিয়ে এসে ওদের ওপর মালের বোঝা চাপাতে লাগল। মালপত্রও প্রচুর। কারণ সূর্যাপেটে জমিদারের ছেলের বিয়ের পাকা দেখা। চার-চারটি পালকি প্রস্তুত। একটিতে সওয়ার হবেন জমিদার জগন্নাথ রেড্ডি। শ্রীপুরম পাত্তিপাড়ো এবং আশপাশের আরও চল্লিশটি গ্রামের সে একচ্ছত্র অধিপতি। দ্বিতীয় পালকিটি জগন্নাথ রিড্ডির ছেলে প্রতাপ রেড্ডির—সূর্যাপেটে তারই শাদির আশীর্বাদ। তৃতীয় পালকিটিতে যাবেন প্রতাপ রেড্ডির মা। শাদি উপলক্ষে সূর্যাপেটে তাকে তো যেতেই হবে। ‘থম দুটি পালকির দরজা উদোম। তৃতীয় এবং চতুর্থ পালকি দুটিতে আবরু রয়েছে। কিন্তু চতুর্থ পালকিটি একেবারে নতুন। নকশা-কাটা। পালকির দু'পাশে লাল টকটকে সিল্কের কারুকার্য-করা পর্দা ঝোলানো। আর সেই পর্দার ওপর মৃদু-মৃদু হাওয়া ঢেউ খেলে যাচ্ছে। পর্দার ওপর সুতো দিয়ে গাথা কাঁচের টুকরোগুলো হাওয়ায় এমন সুন্দর ঝনঝন করে বেজে উঠছিল, যেন লুকোচুরি খেলার সময় একসঙ্গে এক দঙ্গল মেয়ে খিলখিল করে হেসে চলেছে।

রাঘব রাও এক অদ্ভুত বিস্ময়ে—আবেশ-মাখানো মুগ্ধ নয়নে সেই আবরুওয়ালা পালকির দিকে তাকিয়ে ছিল। সে তার বাবাকে জিজ্ঞেসও করেছিল। কিন্তু তার বাবা প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে তাকে শুধু একটি ঘুষি মেরেছিল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি এবং সরগোল চলল। তারপর জমিদারের কাফেলা গড় থেকে সূর্যাপেটের দিকে রওনা হল।

প্রতিটি পালকির সঙ্গে আট-আট জন করে গোলাম। প্রথম পালকিটি মালিকের, দ্বিতীয়টি মালিকের পুত্রের, তৃতীয়টি মালিকের স্ত্রীর। আর চতুর্থ পালকিটি ছিল একেবারে খালি। রাঘব রাও ঠিক বুঝতে পারল না, চতুর্থটি খালি যাচ্ছে কেন! বিরাইয়ার ডিউটি পড়েছিল মালিকের পালকিটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার।

আর এক বিরাট আয়না বয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়েছিল রাঘাব রাও-এর ওপর। সে বার বার আয়নায় তার মুখের প্রতিবিম্ব দেখছিল, আর দেখতে দেখতে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠছিল। চতুর্থ পালকিটির সঙ্গে তালে তাল রেখে সে আয়না নিয়ে ছুটছিল। এই পালকিটি যারা বয়ে নিয়ে চলেছিল, তাদের মধ্যে ছিল গোলাম অগণ্ডুও। অগণ্ডু তার বাবার দোস্ত। তাই রাঘব রাও তার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। যখন সে দেখল তৃতীয় আর চতুর্থ পালকিটির মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান অনেক বেড়ে গিয়েছে, তখন সে একবার চারদিক সতর্কভাবে দেখে দিল। দেখে নিয়ে অগণ্ডুকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কাকা, এই শূন্য পালকি কার জন্যে বয়ে নিয়ে যাচ্ছ?'

অগণ্ডু উত্তপ্ত হয়ে উঠল। জবাব দিল, 'তা আমি কি করে বলব।'

'বল না কাকা।' রাঘব রাও আবদারের কণ্ঠে বলল।

জমিদারের পাইক তাকে মেলা থেকে পাকড়িয়ে এনেছে বলে অগণ্ডুর মেজাজটা তিরিক্ষি হয়েছিল। বছরের প্রতিটি দিন মালিকের, কিন্তু মেলার এই দিনটি গোলামদের। তাই কোন কথার জবাব অগণ্ডু ভালোভাবে দিতে নারাজ। কিন্তু ছেলেটার ঔৎসুক্য এবং সরলতা তার মনের যে রোষ, সেই রোষকে গলিয়ে জল করে দিল।

অগণ্ডু চারদিক এক লহমা দেখে নিয়ে বলল, 'এতে জমিদারের মায়ের ইয়ে (গালি দিয়ে) আসবে।'

রাঘব রাও অগণ্ডুর কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'কে আসবে?'

'ওর ছেলের (গালি দিয়ে) আর মার (গালি দিয়ে) ইয়ে আসবে।'

রাঘব রাও কিছুই বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে অগণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মাটিতে এক গাদা থুথু ফেলে অগণ্ডু বলল, 'আজ থেকে এক বছর পরে যখন মালিকের ছেলের বিয়ে হবে, তখন পালকি করে কনেকে সূর্যাপেট থেকে শ্রীপুরমে আনা হবে। আর সে-সময় আমাকে আর তোকেই সেই পালকি বয়ে আনার জন্যে যেতে হবে।'

এমন সময় জমিদারের এক পাইক এসে অগণ্ডুকে খুব জোর এক গুতো দিয়ে বলল, 'কি শুধু বকবকই করবি, না পা চালাবি। দেখছিস না, তৃতীয় পালকিটি কতদূর এগিয়ে গিয়েছে।'

অগণ্ডু এবং অন্য গোলামরা পালকি নিয়ে খচ্চরের মতো টগবগ টগবগ করে ছুটতে লাগল। রাঘব রাও-ও আয়না নিয়ে ওদের তালে তাল মিলিয়ে হুম হুম করে ছুটতে লাগল।

শ্রীপুরম থেকে সূর্যাপেটের পথ খুবই কষ্টকর। কষ্টকর পথ হলেও রাঘব রাও এই দীর্ঘ সফরের অন্ততঃ দু'টি কথা কখনও ভুলতে পারবে না। প্রথম যে স্মৃতিটি আজও তার মনে জ্বলজ্বল করছে, তা হচ্ছে গ্রাম ছাড়িয়ে অনেক দূরের এক পাহাড়ি চড়াই পথ। সেই পথের বাঁক ঘুরে পাহাড়ের চূড়া থেকে সে তার বহু দূরের গ্রামকে দেখে। আর তার সেই বহুদূরের গ্রামখানি যেন আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়ে ঝলমল করে ওঠে। ঝলমল করে ওঠে তুলোর বিস্তীর্ণ খেত, যে তুলো হচ্ছে অন্ধ্রের শুভ্র তুষার। নারকেল পাতায় আচ্ছাদিত এবং পরিবেষ্টিত ঘর-গুলোর মাঝখানে কষ্টি-পাথরের একটি মণ্ডপ। মণ্ডপের ঝুলনে মানুষ দোল খেয়ে চলেছে। একটু দূরেই অন্ধকার ক্রমেই ঘন থেকে ঘনতর হয়ে আসছে। আর আশ্রয়ের জন্যে পাখিরা সেদিকে উড়ে চলেছে।

দুর্গম পথের সমস্ত রকম দুঃখ-কষ্ট এবং ক্লেশ যেন রাঘব রাও এক নিমেষের জন্যে ভুলে গেল। তার বাড়ি তার গ্রাম আর গ্রামের দীঘি যেন অসাধারণ ছবির মতো তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। এত দূর থেকে সে কোন দিন তার বাড়ি—তার গ্রামকে দেখেনি।

তাই জীবনের এই সৌন্দর্য—যে সৌন্দর্য একাত্মতা সৃষ্টি না করে ব্যবধান সৃষ্টি করে, সেই সৌন্দর্যই আজ তার মনের আয়নায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করল। এই বাড়ি এই গ্রাম আর এই দেশের যে সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যের আবছা স্মৃতি এখনও তার স্মৃতির মনিকোঠায় জাগরুক হয়ে রয়েছে। এখন, এই মুহূর্তে জেলের অন্ধ কুঠরীর চার পাষান দেয়ালের মধ্যেও চোখ বুজে সে সেই সৌন্দর্যকে অনায়াসে অবলোকন করতে পারে। এই সৌন্দর্যকে পরখ করার—তাকে স্পর্শ করার বা তা পুড়িয়ে খাঁক করার সমস্ত রকম অধিকার তার অবশ্যই আছে। কারণ এই সৌন্দর্যের জন্যেই সে সারা জীবন ধরে লড়াই করে এসেছে।

এই সফরের আর একটি ঘটনা, যে ঘটনার কথা আজও তার মন থেকে মুছে যায়নি বরং সে রাতে সুর্যাপেটের এক আস্তাবলে সে যা অনুভব করেছিল, তা তেমনিভাবে তার অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে আছে।

এই আস্তাবলেই গ্রামের পাটোয়ারি শ্রীরামা পুত্তলু পুরোহিত শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী এবং পুলিস প্যাটেল লক্ষ্মীকান্ত রাও এবং অন্যান্য গন্যমান্য অতিথীদের ঘোড়া বাঁধা ছিল। আর এই আস্তাবলেই গ্রামের গোলমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু যে কথা সে আজও ভুলতে পারেনি—তার মনে গেঁথে গিয়েছিল, তা ঘোড়ার নাদের বা আস্তাবলের দুর্গন্ধ কিম্বা স্যাঁতসেঁতে মাটির শীতলতা এবং কাঠিন্য মোটেই নয়। তা হচ্ছে, সেই রাত্রে আস্তাবলের চত্তরে পত্তিপাড়ির কথকদের গাওয়া লোকগাথা।

এই কথকরাও জগন্নাথ রেড্ডির সম্পত্তি। বিয়ের এই পাকা দেখার শুভলগ্নে তাদেরও ডাকা হয়েছিল। তিনজনের এই দলটির মধ্যে একজনের ছিল ধবধবে সাদা দাড়ি। সে হচ্ছে কথকতার ব্যাখ্যাকার। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোর শিখায় তার সারা মুখ যেন অন্ধ্রের রক্তিম মাটির মতোই দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল। আর তার মুখের ত্বকে এত ভাঁজ, দেখলে মনে হয় তা যেন অন্ধ্রের তামাম ক্ষত-চিহ্ন। তার হাতে একতারা। দ্বিতীয়জন বিদুষক। বয়সে তরুণ।

মাথায় এক বিরাট পাগড়ি। তার সমস্ত মুখাবয়বে জীবনের এমন এক দ্যুতি ঝিলিক দিয়ে উঠছিল, মনে হচ্ছিল তা যেন ছলকে-ওঠা টইটম্বুর মধুর ভাণ্ড। সেই টইটম্বুর মধুর ভাণ্ড বিভীষিকাময় এবং বিপদসঙ্কুল জীবনে পরাজিত হওয়া কাকে বলে তা যেন জানে না। এই বিদূষক তরুণটি তার কথকতার মধ্যে টেনে নিয়ে আসত হাসি আর কৌতুকের উপাদান। আর সেই কথকতার উপাদানের মাঝে-মধ্যে সে হাজির করত তীর্যক প্রশ্ন। মানুষ সেই তীর্যক হাজারো প্রশ্নে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত। আর তৃতীয় কথকের হাতে ছিল এক বুর্‌রা। সে সেই বুর্‌রাতে মৃদঙ্গের মতো বোল তুলছিল।

রাত ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর এবং চারদিকে একটা নিস্তব্ধতা ছেয়ে এল। ঘোড়াগুলো ইতিমধ্যে বজরা এবং গোলামরা সেদ্ধ-করা বজরা দিয়ে উদরপূর্তি করে নিয়েছে।

কথকরা আস্তাবলের কাছেই একটি পুকুরের ধারে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিল ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়ানের জন্যে। আর প্রদীপের সেই টিমটিম আলোর মাঝে কথকরা তাদের কথকতা শুরু করে দিল।

কথক মৃদঙ্গ বাজিয়ে বলতে লাগল, 'আজ থেকে অনেক—অনেক দিন আগে···

ভাঁড় তার কথার রেশ ধরে বলে উঠল, 'যখন জগন্নাথ রেড্ডির কোন নাম-নিশানা ছিল না···

কথক তার মৃদঙ্গে তুমুল বোল তুলে বলে উঠল, অনেক, অনেক দিন আগে···

ভাঁড় বলল, যখন গোলামরা সফেদ চাল খেত, আর সফেদ রেশমের কাপড় পড়ত···

কথক তার কথার মাঝখানেই বলে উঠল, আজ থেকে কয়েক শ' বছর আগে, যখন ওয়ারঙ্গলে কাকিত্য রাজ্য স্থাপিত হয় আর যে কাকিত্য রাজ্য শাসন করতেন উরমা দেবী, তখন···তখন বেলমপল্লীর খুব কাছে এক যোগী থাকতেন।

কথকতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মৃদঙ্গ এবং একতারা সমানে বেজে চলেছে! বাজনার সঙ্গে সঙ্গে চলছে ভাঁড়ের চুটকি। রাঘব রাও যেন সুদূর অতীতের বিশাল অন্ধ্রের এক ঐশ্বর্যময় প্রাচীন মাটিতে বিচরণ করতে লাগল। আর গোলমরা যেন মুহূর্তের মধ্যে তাদের সমস্ত সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে সেই কথকতার মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে গেল।

গাথায় ছিল এক তরুণ যোগী আর রাজকুমারীর কাহিনী। রাজকুমারীর বাবা বৈষ্ণব উপাসক আর যোগী ছিলেন শিবের উপাসক। যোগীর আবির্ভাব হয়েছিল এই সংসারের অন্যায় আর অত্যাচার ধ্বংস করার জন্যে। তিনি তাঁর এই নতুন মতবাদকে প্রচার করে চলেছিলেন। পথেই একদিন রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর দেখা ··

অনেক, অনেকক্ষণ ধরে একতারার সুর আকাশে গুঞ্জরিত হতে লাগল। আর সেই সুরের মোহময় গুঞ্জরণের সঙ্গে যেন রাজকুমারীর মুখাবয়ব গোলামদের বিস্ফারিত চোখের তারায় দোল খেতে থাকে। পুকুরের জলে সেই প্রদীপের শিখা অনেক—অনেকক্ষণ ধরে ঝিলমিল করতে করতে এক আবেশ সৃষ্টি করে চলে। আর নীল আকাশের গায়ে খচিত অসংখ্য নক্ষত্রও মিট মিট করতে থাকে।

রাঘব রাও ঠিক বুঝতে পারে না, সে ঘুমিয়ে ছিল, না জেগে ছিল। ভোর রাতে, যখন নতুন দিন এসে রাতের স্বপ্নকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিল—যখন ভোরের মিষ্টি আলো এসে তার চোখের পাতায় ঝাপটা মারতে লাগল, তখনই যেন ফিরে এল তার সম্বিত। যে দেখল, তার বাবা তখনও অঘোরে ঘুমচ্ছে। আর ঘোড়াগুলো চিহি চিহি করে বারবার মাটির ওপর তিরিক্ষি মেজাজে খুর ঠুকে চলেছে।

এরপর অনেক, অনেকক্ষণ ধরে রাঘব রাও-এর মনটা কেমন উদাস হয়ে থাকে। কখনও কখনও বা জীবনের এক একটা ঢিমে-তেতলা সুর, এক একটা ছোট্ট ঘৃণা বুদবুদের মতো মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। আর বারবার জগন্নাথ রেড্ডি পুলিস প্যাটেল এবং গ্রামের অন্যান্য মালিকদের মুখ চোখের সামনে এসে হাজির হয়, আবার বিলীন হয়ে

যায়। সে সেই সময় ঘৃণার দিকে বেশী নজর দেয়নি, কারণ সে জানত তার মনে যে বিষাক্ত কাঁটা গাছ অঙ্কুরিত হয়েছে, তার গোড়ায় সে শুধু ঘৃণার সারই ঢেলে ছিল। শুধু ঘৃণার জন্যে ঘৃণা, এই তত্ত্বে সে আজ আর বিশ্বাসী নয়। তাই সে অনেকগুলো মুহূর্ত লাফিয়ে পাড় হয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। হাজারো রকম পাই-পয়সাকে স্পর্শ করে সে আবার তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—শৈশব থেকে যৌবনে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎই তার, বন্ধু নাগেশ্বরের কথা মনে পড়ে গেল। সে এখন তারই পাশের এক অন্ধ কুঠরীতে বন্দী হয়ে আছে।

দেখতে-শুনতে নাগেশ্বর রাঘব রাও-এর মতো মাঝারি গড়নের নয়। প্রায় ছ'ফুটের ওপর লম্বা। যেমন সুঠাম দীর্ঘ তার দেহের গড়ন, তেমনি মজবুত আর দীর্ঘ তার লাঠি। কথাও বলে চড়া গলায়!

নাগেশ্বর ভোগাবতী নদীর ও পারের জঙ্গলে গরু-মোষ চরাত—আর গান গাইত। রাঘব রাও যখন মাঝে মাঝে গোলামীর হাত থেকে মুক্তির জন্যে পালিয়ে বেড়াত, তখন নাগেশ্বর তাকে আশ্রয় দিত।

নাগেশ্বর এবং রাঘব রাও-এর মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, সেই বন্ধুত্বের পেছনে ছিল এক রাশ ঘৃণা। নাগেশ্বর জমিদারকে ঘৃণা করত। কারণ জমিদার দাম না দিয়েই বছরে অন্ততঃ দু-চারবার তার ছাগল-ভেড়া জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। রাঘব রাও জমিদারকে ঘৃণা করত, কারণ সে গোলাম, তার বাবা গোলাম। বিরাইয়া হামেশাই বলত, এমন একদিন ছিল, যখন তারা গোলাম ছিল না—তাদের জমি হাল বলদ তুলো সোনালী ফসল আঙ্গিনায় শিশুদের কলকণ্ঠ আর বউদের কণ্ঠে গান—সবই ছিল। ঘৃণা এবং রাগে বিরাইয়া চীৎকার করে বলে উঠেছিল, "ঐযে সামনে জমিদারদের বিরাট রমরমা গড় দেখছিস, এই গড় আমাদের সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আমাদের মানুষ থেকে পশুতে পরিণত করেছে। আমার বাবা তার এই ঘৃণা আমাকে

দিয়ে গিয়েছে। তুই এখন বড় হয়েছিস, আমার সমস্ত ঘৃণা আমি তোকে দিয়ে যাচ্ছি। মানুষ তার সন্তানকে সম্পত্তি দেয়—জমি দেয়, আমার কাছে জমি-জমা সম্পত্তি কিছুই নেই, আছে শুধু ঘৃণা। এই ঘৃণাই আমি তোকে উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে যাচ্ছি। বোঝা বইতে বইতে আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, এখন আমার মধ্যে আর তেমন কোন শক্তি নেই। শক্তি কি ভাবে সঞ্চয় করতে হয় তা আমি জানি না। সম্বলের মধ্যে আছে শুধু এই ঘৃণাটুকু। আমি তা তোর জিম্মায় রেখে যাচ্ছি। যদি কোন দিন পথ খুঁজে পাস, তবে খুঁজে নিস।

সেদিন থেকেই রাঘব রাও এই অনন্য পবিত্র ঘৃণাকে পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে সযত্নে তার অন্তরে রেখে দেয়। সে তার জীবনের ব্যক্তিগত অনুভূতির সাহায্যে এই অনন্য ঘৃণার প্রসার ঘটিয়েছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের জীবন তাকে বলে দিয়েছে, জমিদারের এই গড় শুধুমাত্র তাদের বংশ—তাদের পরিবারের শত্রু নয়,—রামলু অগণ্ড সোমপ্পা ভেঙ্কটরাও—হাজার হাজার গোলামদেরও শত্রু। তাদের সোনালী শস্য খেত গান ঘর-দোয়ার তুলোর সফেদ ফুল বউদের হাসি —সমস্ত, সমস্ত কিছুই এই গড় ছিনিয়ে নিয়েছে।

এই ঘৃণাই নাগেশ্বর আর রাঘব রাও-এর বন্ধুত্বকে অঙ্কুরিত করেছে —দৃঢ়তর করেছে। এই ঘৃণাই ধীরে ধীরে রাঘব রাওকে এক বাস্তব সত্যে এনে দাঁড় করিয়েছে—এই দুনিয়াতে প্রতাপ রেড্ডিদের সংখ্যা বেশী নয়। গোলাম রাঘব রাও-রাই সংখ্যায় অগন্য। যদি একদিন এই গোলামদের মধ্যে একতা গড়ে ওঠে, তবে গড়ের এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেশী দিন অটুট থাকবে না— ফাটল ধরবেই, ভেঙ্গে পড়বেই। এই চিন্তা-ভাবনা একদিনে তার চেতনার জগতে আসেনি। খুব ধীরে ধীরে অস্পষ্ট ধোঁয়াসার পথ বেয়ে বেয়ে এই চিন্তা তার কাছে এসেছে। কিন্তু যা এই ঘৃণাকে প্রবল এবং প্রচণ্ড রূপ দিতে সাহায্য করেছে, তা জমিদারের প্রতি ঘৃণা নয়,—নিজের প্রতি—জীবনের প্রতি এক অসাধারণ মমত্ব এবং ভালোবাসা।

রাঘব রাও আবার ধীরে ধীরে জীবনের মুঠি মেলে ধরে। খোলা

মুঠিতে সে যেন ঘৃণায় দগ্ধ অসংখ্য মুহূর্তের মধ্যে ভালোবাসার এক ঝলমল ঝলকে দেখতে পায়। আনন্দে ভাস্বরিত হয়ে ওঠে ওর সারা মুখ।

চুন্দরী!

বছর তিনেক আগের কথা। তুলোর একটা খেতের কথা ওর মনে জ্বলজ্বল করে ওঠে। সারা খেত যেন তুষারপাতের মতো সাদা-সাদা তুলোর ফুলে ছেয়ে রয়েছে। ভোর থেকেই সে তুলোর ফুল কুড়োনোর কাজে লেগে গিয়েছিল। ধবধবে সাদা ফুলের মধ্যে মাঝে মাঝে দু-একটা ছাই-রঙা ফুল পেয়ে গেলেই সে সযত্নে অন্য ঝোলার মধ্যে তা রেখে দিচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে সে নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলেছিল আর ওর হাত দ্রুত ওঠা-নামা করছিল। কারণ তার বাবা আজ তুলো কুড়োনোর কাজে আসতে পারেনি। তাই দু'জনের কাজ তাকে একাই সারতে হচ্ছিল।

কাজের তালে তালে সে গুন গুন করে গান গেয়ে চলেছিল। রাঘব রাও দেখল, মেয়েটি ফুল কুড়োতে কুড়োতে খেতের অন্য এক প্রান্ত থেকে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে সে গান গাইছিল না, সে গান গাইছিল তার হাতের ক্লান্তি দূর করার জন্যে আর গানের প্রতিটি কলির মধ্যে শ্রম-সঙ্গীত মিশিয়ে দিচ্ছিল। গাইতে গাইতে সে হঠাৎই থেমে যায়। তুলোর ঘন গাছ-গাছালির আড়াল থেকে সে তার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর তার দিকে তাকিয়ে সে নির্ভিকভাবে হেসে উঠল।

অন্ধ কুঠরীতে শুয়ে শুয়েই রাঘব রাও আবেশে চোখ বুজল। চন্দরীকে প্রথম দিন সে যে চোখ দিয়ে যেমন ভাবে দেখেছিল, আজ, এখন সে ঠিক সেই ভাবেই যেন দেখতে পেল।

ওর মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল চুন্দরীর সফেদ দাঁত—ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁতগুলো যেন মুক্তোর মালার মতো তার দু'ঠোঁটের মাঝখানে

ঝকঝক করছে। ওর মনে পড়ে যায়, চুন্দরীর ব্লাউজ। লাল ব্লাউজের ওপর ছোট ছোট কাঁচ বসানো। চুন্দরী যখন ঘুরে দাঁড়াল, ও দেখল ওর ব্লাউজের পেছনের দিকটা খোলা। আর লাল টুকটুকে সুতোগুলো তার সাদা ধবধবে ত্বকের ওপর যেন গোলাপের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে রয়েছে। চুন্দরী আবার এক লহমায় ওর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, ওর চুলের গোছে ঝুলছে দস্তার একটি ঝুমুর। আর ঝুমুরের সঙ্গে বাঁধা সিল্কের লাল সুতো। একটু মুচকি হাসে ও। আর বোধহয় কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে ও ওর ঘাগরার ওপর আঁচলটা ঠিক করে নেয়। রাঘব রাও দেখল ওর আঁচলের রঙও লাল টকটকে। আর তার ওপর বসানো গোল গোল কাঁচ। কাঁচগুলোর ওপর রোদ পড়ে ঝলমল করছে। আর তুলোর শুভ্রতার ওপর সেই ঝলমল আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে যেন চোখকে ঝলসে দিচ্ছিল।

চুন্দরী যখন তুলোর ফুল তোলার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল, রাঘব রাও দেখল ওর কনুই পর্যন্ত শিং আর হাতির দাঁতের একগুচ্ছ চুড়ি। আর ওর বুড়ো আঙুলের ওপর সবজে রঙের একটা নাম খোদাই করা। কপালের ওপরও তেমনি সবজে রঙের বিন্দি খোদাই করা। কপালের বিন্দিগুলোর ওপর ওর চোখ এক নিমেষের জন্যে স্থির হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে লাগল। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে ওর নীলাভ চোখ দুটির মধ্যে রাঘব রাও যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে…। কী ফর্সা, কী সুন্দর একহারা, পাতলা পাতলা ঠোঁট ওর! এসব কিছুই যেন এক নিমেষে ঘটে গেল। পরমুহূর্তেই ও হেসে ওঠে। হাসির এই মুহূর্তটি কিন্তু প্রথমবারের যে হাসি, সেই হাসির মতো তেমন আস্বাদিত—তেমন অসাধারণ নয়। প্রথম বারের হাসির ক্ষণটিকে ও বার বার আস্বাদন করতে চেয়েছে! বনে বাদাড়ে ঘোরার সময়, পুলিস এবং মিলেটারির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে গোপনে পালিয়ে বেরাবার সময়, কাগজের মিলে কাজের দিনগুলিতে, পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপনের সময়, জমিদারের চাবুক খেতে খেতে, জেলে অনশন করার সময়—প্রথম বারের হাসির মুহূর্তটিকে সে বারবার

নিজের কাছে আহ্বান করেছে, আর এই হাসি থেকে সে নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করেছে। আবার কখনও এই মুহূর্তটিই তাকে কেমন কোমল এবং আবিষ্ট করে তুলেছে—তার মধ্যে এনে দিয়েছে একটা নিস্তেজ ভাব। তাই সে এই মুহূর্তটিকে আবার বিনাদ্বিধায় দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আবার কখনও কখনও বা, এই মুহূর্তটি তার অজান্তে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—তার মধ্যে একটা দুঃখ একটা বেদনা জাগিয়ে তুলেছে।

মরুভূমিতে এক বিন্দু জলের জন্যে মানুষ যখন তেষ্টায় কাতর হয়ে ওঠে, তখন জল যেন মৃগতৃষ্ণার রূপ ধারণ করে তার সামনে এসে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি একটা তেষ্টার কষ্ট সে বারবার অনুভব করেছে।

প্রথম মুহূর্তের হাসির এই অসাধারণ সৌন্দর্য লাবণ্য, আর এই সৌন্দর্যের যে প্রাণ বিদারক কষ্ট—জ্বালা, রাঘব রাও তার সঙ্গে গভীর-ভাবে পরিচিত।

এখন, এই মুহূর্তটিকে সে যখন নিবিড় ভাবে পেতে চাইল, তখন সে মধুর মতো মিষ্টি এক অসাধারণ শান্তি—এক গভীর বেদনা অনুভব করল।

তিন

চুন্দরী লোম্বড়ি গোষ্ঠীর মেয়ে। ওর বাবার নাম ভাগ্য। ভাগ্য সুরেলা গলার এক যাযাবার। নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গে দিন কয়েকের জন্যে ভোগাবতী নদীর পাড়ে আস্তানা গাড়ে। তুলোর খেতে এই ফুল ফোটার মরশুমে যাযাবরদের কাজে লাগানো হয়। তাই চুন্দরীও ফুল সংগ্রহের কাজে লেগে গিয়েছে। যখন ফুল তোলার মরশুম নয়, তখন সে সাধারণত জঙ্গল থেকে শস্তালু-কাঠ সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করে ফেরি করে। কখন কখনও বা বাবলা গাছ থেকে গদ সংগ্রহ করে শহরতলীতে ঘুরে ঘুরে হেঁকে বেড়ায়, 'গদ নেবে গো, গদ।'

এই প্রথম মুহূর্তের পর আরও অনেক—অনেক মুহূর্ত রাঘব রাও-এর কাছে আসে। কারণ রাঘব রাও যুবক আর চুন্দরী যুবতী। আর তাই তাদের দুজনের কাছে এমন এক সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠছিল – যে সম্ভাবনা হচ্ছে বীজ বোনাও যাবে, ফসল কাটাও যাবে। এই দ্বিতীয় যে মুহূর্তটি, তার মধ্যে আছে সুগন্ধে ভরপুর ফসলের খেত, রাগ আর মান-অভিমানের ভান, পালিয়ে যাবার এক মিথ্যে অভিনয় —যেন এ সব কিছুই এক স্রোতস্বনী নদী, এক প্রসারিত তরঙ্গ।

আর চুন্দরী যখন একদিন সত্যিসত্যি রাঘব রাও-এর বাগদত্তা হল, তখন সে যেন আপছে-আপ নৃত্যে পারঙ্গমা হয়ে উঠল। কিন্তু নিজের গোষ্ঠীর বা অন্য কোন পুরুষের সামনে সে কোন দিন নাচত না—নাচত একান্তভাবে তার ভাবী স্বামীর সামনে। জঙ্গলে নাগেশ্বরের যে ঝুপড়ি, সেই ঝুপড়ির সামনে তাঁতে-বোনা লাল মোটা কাপড়ের ওপর ফুল-তোলা ঘাঘরা পরে সে নাচত। ঘাঘরার ওপর ছিল দেড় ফুট চওড়া রূপোলী জড়ির পাড়। হাঁটু পর্যন্ত ঘাঘরায় ঢাকা। পায়ের গোছায় সাপের ফনা-তোলা কাঁসার গয়না। নাচের সময় ফনাগুলো দুলতে থাকত। নাচ দেখতে দেখতে রাঘব রাও-এর

চোখের সামনে ভেসে উঠত বন্ধ এক পালকির ছবি। আর সে পালকি যেন রঙীন, নকশাকাটা আর দু'ধারে সিল্কের পর্দা ঝোলানো। সেই পালকি আজ আর খালি নয়।

রাঘব রাও-এর আবার মনে পড়ে গেল সেই অনন্য মুহূর্তগুলি! যখন চুন্দরী তুলোর ফুলগুলি জড়ো করল আর ও প্রায় তৃতীয় প্রহরের কাছাকাছি ভোগাবতী নদীর দিকে রওনা হল—যেখানে চুন্দরীর স্বজাতিরা ডেরা বেঁধেছে। পথে রামলু গোয়ালার সঙ্গে দেখা হল। তাকে দেখে সে একটু মুচকি হাসল—কোন কথা বলল না। সে তা বিশেষভাবে গ্রাহ্যই করল না, কিন্তু ওর হাসিটা কেমন যেন বিষাদময়। পথে আবার রেড্ডু কাকার সঙ্গে দেখা হল। কাকা তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল। কিন্তু সে তখন খুশী আর আনন্দে আত্মমগ্ন।

রাঘব রাও এগিয়ে চলে। ভাবে স্বজাতির বাইরে প্রেম করেছি বলে বুড়ো হাসছে।

হাসে তো হাসুক—তাতে কি যায় আসে। রাঘব রাও মাথা নীচু করে শিউলী গাছের ঝোপের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে যে পথটা ধরল, তার দুপাশে সার সার ফনিমনসার গাছ। পথটি সটান যাযাবরদের ডেরার দিকে গিয়েছে। প্রায় আধ মাইল চলার পর, সে এমন একটা জায়গায় এসে পড়ল, যেখানে যাযাবরদের গাধাগুলো চরে বেড়াচ্ছিল। কাছেই যাযাবরদের ডেরা। কোন কোন ডেরা পাটকাঠি, আর কোন কোনটা বা তালপাতা দিয়ে তৈরি। পুরুষরা চাটাইয়ের ওপর বসে চাটাই বুনে চলেছে, আর আর মেয়েরা শম্ভালুর ডাল দিয়ে ঝুড়ি বুনছে। একজন বুড়ি একাকী বসে যৌবনের গান গেয়ে চলেছে। আর যুবতীরা তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সমানে হেসে চলেছে। এসব দেখতে দেখতে রাঘব রাও ভাগ্য-র ঝুপড়িতে এসে পৌঁছল। ভাগ্য একটা উনুনের ওপর ঘি-তে পান এবং লবঙ্গ দিয়ে গরম করছিল। রাঘব রাও তাকে জিজ্ঞেস করল, এ দিয়ে কি হবে? ভাগ্য চোখ টিপে বলল, পান আর লবঙ্গ দিয়ে ঘি জ্বাল দিলে, খাঁটি ঘি বলে মনে হয়।

—'খাঁটি ঘি কেন বেচ না ?'

—'আরে খাঁটি ঘি কিনবে কে ? এত দাম হয়ে যায়, তাই ভেজাল ঘি-কে খাঁটি ঘি বলে চালাই।

—চুন্দরীকে দেখছি না, সে কোথায় ?

—'এই এসে গেল বলে, তুমি বস।'

—'কোথায় গিয়েছে ?'

—'গড়ে। জমিদারের ছেলে ডেকে পাঠিয়েছে।'

রাঘব রাও-এর বুকটা ধক করে ওঠে। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করল, 'জমিদারের ছেলে ডেকে পাঠিয়েছে কেন ?

'কেন ডেকে পাঠিয়েছে, কি করে বলব ?' ভাগ্য কাঠের একটা চামচ দিয়ে ঘি নাড়তে নাড়তে বলে, 'ভোরে গিয়েছে, এক্ষুনি এসে যাবে, তুমি বস।'

রাঘব রাও মাটির ওপর বসে পড়ে।

তৃতীয় প্রহর পার হয়ে গেল। সন্ধ্যাও উতরে গেল। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আকাশের যে রক্তিমতা তাও ক্রমশ বিলীন হতে লাগল। আর এই সময় চুন্দরী জমিদারের গড় থেকে ফিরে এল। রাগে—ক্ষোভে লাল হয়ে-ওঠা রাঘব রাও-এর মুখ দেখে সে মুহূর্তের জন্যে ভয়ে কুঁকড়ে যায়। অবশেষে সাহসে বুক বেঁধে রাঘব রাও-এর সামনে এগিয়ে আসে। হেসে বলে, 'তুমি কখন এসেছে ?'

রাঘব রাও ওর কথার কোন জবাব দেয় না।

চুন্দরী তার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচল নিয়ে আনমনে খেলতে থাকে।

অত্যন্ত নরম এবং আবেশ বিস্মিত কণ্ঠে চুন্দরী রাঘবকে জিজ্ঞেস করে, 'ফনিমনসার সরবৎ খাবে ?'

রাঘব রাও রাগে চীৎকার করে ওঠে, 'না, না, আমার কিছু চাই না।'

বিস্মিত চোখ দুটি আয়ত করে চুন্দরী বলে, 'কি হয়েছে, অমন চিল্লাচ্ছ কেন ?'

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

চুন্দরী বলল, 'প্রতাপ রেড্ডি ডেকে পাঠিয়েছিল।'

—'তুমি সেখানে কেন গেলে?'

—'কেন যাব না! মালিক ডেকে পাটিয়েছে যে।' চুন্দরীর চোখে-মুখে বিস্ময়।

—'সেখানে কী কী হয়েছে?'

এতক্ষণ চুন্দরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এবার রাঘব রাও-এর পাশে থপ করে বসে পড়ে ক্লান্ত স্বরে বলল, 'এমন নতুন কিছু হয়নি। সাধারণত যা হয়, তাই-ই হয়েছে।'

রাঘব রাও চীৎকার করে ওঠে, 'বেশ্যা কোথাকার!'

—'না, আমি বেশ্যা নই।' রাগে জ্বলে উঠে চুন্দরী বলল। 'আমি তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিয়েছিলাম, সে আমার সঙ্গে যা ইচ্ছে করতে পারে, কিন্তু আমার বুকে হাত লাগাতে পারবে না।'

—'বুকে হাত দেবে না, তার অর্থ!'

চুন্দরী বলল, 'কারণ, আমার সন্তান আমার বুকের দুধ খাবে।'

—'আমার সন্তান দুধ খাবে'—এ কথা কটি বলার সময় চুন্দরী এক গভীর ভালোবাসা নিয়ে রাঘব রাও-এর দিকে তাকাল। রাঘব রাও চুন্দরীর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকতে পারে না। খুব ধীরে ধীরে রাঘব রাও চুন্দরীকে বলে, 'চুন্দরী, তোমার এই স্তনই কি শুধু পবিত্র? যে তন্ত্রী দেহে রক্ত সঞ্চারিত করে, সেই তন্ত্রী কি পবিত্র নয়? এই ঠোঁট, যে ঠোঁট শিশুকে চুম্বন করে, সেই ঠোঁট কি পবিত্র নয়? এই বাহু, যে বাহু সন্তানকে কোলে নেয়—দোল খাওয়ায় তা কি পবিত্র নয়? চুন্দরী, তুমি তোমার সমস্ত দেহটা নিয়ে পবিত্র হতে পারতে, কেন তুমি তোমার পবিত্রতাকে এমন টুকরো টুকরো করে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিলে!'

চুন্দরী রাঘব রাও-এর কথার কোন জবাব দিল না। কারণ ওদের গোষ্ঠীর কোন মেয়েই এই প্রশ্নের জবাব জানে না। এই অত্যাচার—অপমান কিভাবে প্রতিরোধ করতে হয়, তা তাদের জানা

নেই। সে শুধু নিঃশব্দে কেঁদে চলল।

রাঘব রাও নীরবে—নিঃশব্দে এই টলমল অশ্রুধারার প্রবাহ দেখতে লাগল।···অল্প ক্ষণের মধ্যেই চুন্দরীর চোখের জল নিঃশেষ হয়ে যায়। আর শুকনো মাটির ওপর সেই কান্নার যেন কোন চিহ্নই আর থাকে না।

রাঘব রাও হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। আর হঠাৎই সে এই সত্য উপলব্ধি করল, এই আবহমান-অশ্রুধারা যেন অন্ধ্রের মটিকে আর সিক্ত করতে না পারে, তার জন্যে কৃষককে তার বুকের রক্ত ঢালতে হবে।

মুহূর্তের মধ্যে রাখব রাও যেন তার ভালোবাসার প্রতিটি ক্ষণকে এক এক লাফে পার হয়ে গেল। আর এই এক মুহূর্তের মধ্যে সে তার স্মৃতির অনেক—অনেকগুলি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পার হয়ে এল। এই মুহূর্তে সে যখন উঠে দাঁড়াল, ওর মনে হল, ও যেন সম্পূর্ণভাবে এই নতুন মুহূর্তের হাত ধরে আছে।

সেদিন রাত্রে সে আর বাড়ি ফিরে যায় না। গ্রাম ছেড়ে অনদৃষ্টের পথে পা বাড়ায়। এই পথ দিয়ে ও একদিন গোলাম হয়ে হেঁটে গিয়েছিল, কিন্তু আজ সে গোলাম নয়—সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, মুক্ত। আজ ওর হাতে এক নতুন আয়না। যেন রঙীন নকশা-কাটা পালকি নিয়ে ও এক নতুন কনের সন্ধানে চলেছে।

চার

আজ পর্যন্ত যা কিছু ওর জীবনে ঘটেছে, তার খানিকটা এখান থেকে খানিকটা ওখান থেকে রাঘব রাও দেখে নিতে পারে—যেন বা ঘটনার যে শৃঙ্খল, সেই শৃঙ্খলের মাঝখানের কড়াগুলি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। এই কড়াগুলিই জীবনকে শুরু থেকে শেষ অবধি এক এক করে গেঁথে দেয়। কিন্তু এই গ্রন্থীর বাইরে, যা কিছু ঘটেছে তা সে পয়সার মতো উঠিয়ে দেখতে অক্ষম। যখন সে জীবনের একটি ক্ষণ—একটি মুহূর্তকে উঠিয়ে পরখ করতে চায়, তখন অন্য একটি ক্ষণ—অন্য একটি মুহূর্ত তার আকাঙ্খার ক্ষণটির সঙ্গে উঠে আসে। ঘটনাগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ, আর এই শৃঙ্খলা ঘটনাকে গাঁথতে গাঁথতে এগিয়ে চলেছে। কখনও, কোথাওবা সে প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়েছে। কখনও কখনও পথের মাঝখানে মরুভূমির মধ্যে দিশেহারা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত সমস্যা এবং বিপদ-আপদের মধ্যেও সে এক প্রদীপ শিখাকে দেখেছে। যদি এই প্রদীপ শিখা না থকত, তবে সে বিপদের মধ্যে দিয়ে এগুতো কিভাবে, যে বিপদগুলো গত তিন বছর ধরে তাকে সহ্য করতে হয়েছে।

প্রথমে সে জানত না, কোথায় যাচ্ছে, আর কিইবা করতে চায়। জীবন সম্পর্কে এক অস্পষ্ট—আপছা ধারণা ওর ছিল। অত্যাচারের এক মুক অনুভূতি, ভালোবাসার এক অতৃপ্ত তৃষ্ণা, যে অনুভূতি আর তৃষ্ণা সুর্যাপেট-এ তিন-চার বছর এক নাগরে বাসন মাজার কাজ করার পরেও সে মুছে ফেলতে পারিনি। যে বেনের স্ত্রীর ও চাকরের কাজ করত, সারা দিনমান হাড়ভাঙা খাঁটিয়ে ওকে যে রুটি দিত, তাতে কোন রকমে প্রাণটুকু বেঁচে যেত। তাদের গাঁয়ে প্রতাপ রেড্ডিও তাই করত। যেদিন বেনের বাড়িতে অসময়ে কোন অতিথি এসে পড়ত, সেদিন তাকে না-খেয়ে থাকতে হত। গ্রামেও তাকে এভাবে কতদিন না খেয়ে থাকতে হয়েছে।

কথায় কথায় রাঘব রাও জানতে পারে, এই গ্রামে বেনের অনেক জমি-জমা আছে। সে আরও অনেক জমি কেনার ধান্ধায় ঘুরছে। বাসনমাজার কাজ করতে করতে রাঘব রাও তার চোখের সামনেই এক ক্ষুদে জগন্নাথ রেড্ডিকে জন্ম নিতে দেখল। একথা অবশ্য ঠিক. এই বেনের বাড়ি তেমন পেল্লাই ছিল না। এই বাড়ির চারিদিকে কোন চটকদার গড়ও ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার ক্ষুধা—একজন বাসন-মাজা মানুষের ক্ষুধা তার গ্রামের গোলামদের যে ক্ষুধা তার সঙ্গে তুলনা করতে অবশ্যই পারে। সে তার শ্রম এবং মজুরির সঙ্গে গোলামদের শ্রম এবং মজুরির তুলনা নিশ্চয়ই করতে পারে। ক্রমে ক্রমে সে উপলব্ধি করে, গোলাম শুধু গ্রামেই থাকে না, শহরেও থাকে। ভগবান নিজের হাতে রেড্ডি তৈরি করে পাঠান না, ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকারে রেড্ডি তৈরি হয়।

রাঘব রাও এই বাস্তব সত্য যখনই অনুভব করে, যখন বেনে দু-তিনবার তাকে ব্লাক মার্কেটের মালপত্র বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজে লাগায়। আর প্রতিবারই বেনের থলি ভরে গিয়েছে, আর রাঘব রাও-এর পেট থেকেছে খালি। বেনের থলির সঙ্গে তার পেটের খিদের তুলনা না করাই ছিল অবাস্তব। সে এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর তার পৈশাচিক রূপ প্রত্যক্ষ করছিল। কি এক ভয়ঙ্কর তামাশা তার চোখের সামনে খেলা করে চলেছিল। জগন্নাথ রেড্ডির অন্দর মহলে যাওয়া এবং দেখার তার কোন সুযোগ হয়নি। কিন্তু এখন সে শত্রুর অন্দর মহলেই বাস করছে—দিন রাত্রি—সর্বক্ষণ বেনে আর তার স্ত্রীর কথাবার্তা শুনছে। এই সব কথাবার্তার মধ্যে জমি আর টাকা-সংক্রান্ত কথা হামেশাই হত। কিন্তু তারা তার খিদের কথা কোন দিনই উল্লেখ করত না।

ব্লাক মার্কেটের কাজ-কারবার করার সময় দু-একবার রাঘব রাও-এর মনে হয়েছে, এই সর্বনাশা খেলাটা সে খতম করে দেবে। কিন্তু কি করে করবে? সে তার গ্রামের দুর্বিসহ দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

তার গ্রামের সাম প্যাটেল এবং পুলিস প্যাটেলের যে দহরম মহরম, তা তার স্মৃতি থেকে এখনও মুছে যায়নি। কোন খবরের কাগজ পড়ে সে এই অনুভব—এই অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেনি। সে তার জীবনের প্রতিটি পদে পদে তা পরখ করেছে—তার স্বাদ গ্রহণ করেছে। তাই সূর্যাপেট-এ চার মাস ধরে থাকা সত্বেও, সে কোনদিন ভাবতেও পারেনি, পুলিসের কাছে নালিশ করে কোন লাভ হবে। কেউ যদি তাকে হাজার—লক্ষবার বোঝায়, এ বাপারে পুলিস কিছু করতে পারে, তবু সে তা মেনে নিতে রাজি নয়। যদি কখনও কেউ পুলিসে খবর দেওয়ার পরামর্শ দিত, নিশ্চুপভাবে এক তিক্ত হাসি হেসে সে তার জবাব দিত।

যে গলিতে সে থাকত, সেই গলিতে অন্যান্য বাড়িতে তার মতো আরও অনেকে বাসন-কোসন মাজার কাজ করত। তারা সবাই ছিল শহরের গোলাম। তার মতো অসংখ্য গোলাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে শহরে এসেছে। তাদের পরস্পরেব প্রতি আছে এক অদ্ভুত ধরনের সহানুভূতি! গৃহস্বামীর অনুপস্থিতে তারা মন খুলে তাদের খিস্তি-খেউর দিত। কিন্তু গ্রামের গোলামরা তাদের মালিকদের সাধারনত এভাবে গালিগালাজ করে না। তাই রাঘব রাও এই খিস্তি-খেউরের মধ্যে কোন রকম শান্তি বা আনন্দ খুঁজে পেত না। খিস্তি-খেউড়ে মনের রাগ মেটে হয়তো, কিন্তু পেটের যে খিদে তা দূর হয় না।

একদিন রাঘব রাও তার প্রতিবেশী নোকর ভেঙ্কটকে তার মনের এই কথা বলায়, সে উঁচু গলায় হো হো করে হেসে জবাব দিল, 'রাও, তুই একেবারে নিরেট মুর্খ। এই কথাবার্তার গহীনে কিছুই নেই। খিদে দূর করবার উপায় কি জানিস? মালিক যদি তোকে খেতে চায়, তবে তুইও মালিককে খেয়ে ফেলবি। সবজি-ভাজি, ডাল-রুটি, পান-সুপারিতে যদি কোন মিলমিশ না পাস, তবে বেনের বউয়ের গয়না নিয়েই না হয় কেটে পর। যদি তেমন সুযোগ পাস, তবে বেনের বউকে নিয়েই কেটে পরিস। তুইতো জোয়ান-মরদ। দেখতে শুনতেও

ভালো। গ্রাম থেকে সদ্য এসেছিস, তোর শরীরে এখনও রক্ত আছে।' কথা কয়টি বলে ভেঙ্কট জোর হেসে ওঠে। হেসে উঠে রাঘব রাওএর জানুতে এক জোর চাটি মেরে।

ভেঙ্কট ঐ গলির যত নোকর আছে, তাদের সর্দার। বহু ঘাটের জল খাওয়া। কত জায়গা থেকে যে চুরি-চামারি করে পালিয়েছে, তার ঠিক ঠিকানা নেই। ইতিমধ্যে বার কুড়ি নাম পালটিয়েছে। আরও বার কুড়ি নাম পালটালেও কিছু যায় আসে না। আশ-পাশের প্রতিবেশী বা অন্যপাড়ার ঝি চাকররা ছিচকে চুরি চামারি করলে তাতেও তার বখরা ছিল।

প্রায়ই এইসব নোকরদের মদ খেতে চরস টানতে আর মনিবদের গালি-গালাজ দিয়ে হেনস্তা করতে দেখা যেত। আবার পরক্ষণেই ভিজে বেড়ালের মতো মনিবের বাড়িতে বাসন-কোসন সাফাইয়ের কাজে লেগে যেত।

ভেঙ্কট কয়েকবার জোর করে রাঘব রাওকে তার আস্তানায় নিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু রাঘব রাও নিজেকে ওদের থেকে তফাতে রেখে দেয়। বুঝতে পারে না, এই গোলামদের কোন্ কথা-গুলিতে ওর অরুচি। রাঘব রাও-এর মনে হত, এই ছোট ছোট মুরগীর খুপরিগুলো যেন এক বিশাল ভাটি, যেখানে ধীরে ধীরে মানুষের অপরাধকে আগুনের দিকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভেঙ্কট এবং আর আর চাকর-বাকরদের চাল-চলন ওকে ভিমাইয়া এবং দুর্গায়ার কথা মনে করিয়ে দিত। সে তার বাবার কাছে শুনেছে ভিমাইয়া এবং দুর্গায়ারও একদিন তাদের মতো জমি-জিরাত ছিল। জমি-জিরাত হারিয়ে ওরা খেত মজুর হয়। তারপর গোলাম। এবং শেষে জমিদার আর দেশমুখের ভাড়াটে গুণ্ডাতে পরিণত হয়। সে তার চোখের সামনেই ভিমাইয়া এবং দুর্গায়াকে চরসে টান দিতে বোতল ওড়াতে কোকেন খেতে এবং মৈথুন ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অত্যাচারা গুণ্ডাতে পরিণত হতে দেখেছে। আর শহরের এই গোলামরা তার চোখের সামনেই ভিমাইয়া এবং দুর্গায়ার মতো রূপান্তরিত হতে হতে

নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল—ক্রমেই গাড্ডায় নেমে চলেছিল। আর খিদের জ্বালায় কাতরাচ্ছিল। গ্রামে থাকতে তাদের মধ্যে যে গুনগুলি ছিল, এখানে এসে তা তারা খোয়াচ্ছে। এদের জন্যে রাঘব রাও-এর কাছে এক অজানা ক্ষোভ দুঃখ কষ্ট এবং প্রচণ্ড ঘৃণা ছাড়া আর কিছু ছিল না, —যা দিয়ে সে এই ঘটনাগুলোর যে অবাঞ্ছিত এবং ভয়ঙ্কর ধারা, তা পালটাতে পারে।

রাঘব রাও কিন্তু তার চাষীর বিচার বুদ্ধি নিয়ে শুধু নিজেকেই রক্ষা করতে চাইল। সে খুব বিশ্বস্ততা—খুব যত্ন সহকারে পরিশ্রম এবং মনপ্রাণ ঢেলে বেনের বাড়িতে কাজ করে চলল। নিজের গাঁয়েও সে এমন ভাবে কোন দিন কাজ করেনি। কিন্তু এত কাজ—এত পরিশ্রম করেও কোন ফয়দা হল না। কোন কোন দিন বা বড় জোর, পুরস্কার হিসেবে পেয়েছে দু-একটি বেশী রুটি। কোন দিন বা পেয়েছে বেনের স্ত্রীর ভোদা হাসি বা তারিফ 'ছেলেটি বড্ড ভালো'। দু-চার দিন ভালো ভাবে কাটলেও, আবার যেমন-কে তেমন—সেই খিদে—এঁটো পাত চাটা।

একদিন রসুই ঘর থেকে একটা রেকাবি হারিয়ে গেল। রাঘব রাও-এর ওপরই চুরির অপরাধ চাপানো হল? বেনের বউ তাকে বেধড়ক পেটাল। আর বেনে তাকে পুলিসে দিবে বলে খুব শাসাল। বেনিয়া যখন তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া ঠিক করল, তখন হঠাৎই রেকাবিটা অন্য ঘরের খাটের নিচে পাওয়া গেল। বেনে এবং বেনের বউ দুজনেই এ নিয়ে টু শব্দটি পর্যন্ত করল না। মনিব গোলামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তা কেমন করে সম্ভব!

রাঘব রাও-এর মনে পড়ল, সারা দিন রাত্রে যত বার ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি হয়েছে, তাকে মাপ চাইতে হয়েছে। কারণ সে তো নোকর —স্রেফ গোলাম। যেদিন রাঘব রাও-এর দেহে চুরির কলঙ্ক লাগল, সেদিন তার মন কেমন উদাস—উন্মনা হয়ে গেল। তার এই উদাসী মন হালকা করার জন্যে ভেঙ্কট অশ্লীল সব চুটকি বলতে লাগল। কিন্তু তাতে রাঘব রাও-এর মন এতটুকু শান্ত হল না। ভেঙ্কট তাকে

চরসে টান দিয়ে জীবনের দুর্বিসহ বিভীষিকাকে ভুলে যাওয়ার জন্যে উসকাতে লাগল। কিন্তু রাঘব রাও তার কথায় কান দিল না। রাত্রে যখন রাঘব রাও-এর বাড়ির কাজ কর্ম মিটে গেল, তখন ভেঙ্কট তাকে জোর-জবরদস্তি করে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে মেয়েরা তাদের রূপযৌবন বিক্রি করছিল।

রাঘব রাও এর আগে কোন দিন এদিক মাড়ায়নি। তাই সে ঠিক বুঝতে পারল না, ভেঙ্কট তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে। ভেঙ্কট তাকে শুধু বলে, এমন এক জায়গায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট শেষ হয়ে যায়। রাঘব রাও বারবার জিজ্ঞেস করা সত্বেও বলেনি, সে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

রাঘব রাও হঠাৎ লক্ষ্য করে, তার সামনে একটি মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে। ভেঙ্কট তাকে সামনে ঠেলে দিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে রইল। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার একটি ঘর। সেই ঘরের মধ্যে রাঘব রাও একটি তক্তপোষ দেখতে পেল। ঘরটি খুবই ছোট্ট—আর সারা ঘর যেন অন্ধকারে ঠাসা। সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রাঘব রাও একটি মেয়েকে দেখতে পেল। মেয়েটি ওদের দেখে হাসার চেষ্টা করল। রাঘব রাও ঘুরে দাঁড়িয়ে ভেঙ্কটকে জিজ্ঞেস করল, 'এসব কি ব্যাপার?'

ভেঙ্কট তার হাতে আট আনা পয়সা গুজে দিয়ে বলল, 'যাও বাছা, ফুর্তি কর।' বলে সে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

রাঘব রাও আর সেই মেয়েটি ছাড়া তখন ঘরের মধ্যে আর তৃতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না। মেয়েটি তাকে তক্তপোষ দেখিয়ে বলল, 'বস।' কিন্তু রাঘব রাও না বসে দাঁড়িয়েই রইল। তার কণ্ঠ দিয়ে অনেকক্ষণ কোন শব্দই বের হল না। সে এক দৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটি কটু কণ্ঠে তাকে বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি সঙ দেখছ? বসে পড়।'

রাঘব রাও না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি তোমার বুকে হাত দিতে পারি?'

রাঘব রাও-এর প্রশ্নে মেয়েটি হকচকিয়ে গেল। সে বলল, 'তুমি 'পয়সা দিয়েছ, শুধু বুকে কেন, আমার শরীরের যে কোন জায়গায় হাত দিতে পার।'

ক্ষণিকের জন্যে যেন রাঘব রাও-এর সমস্ত দেহের শিরায়-উপশিরায় বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে গেল। আর কোন প্রশ্ন না করে রাঘব রাও সটান ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মেয়েটি তাকে পেছন থেকে ডাকতে লাগল। কিন্তু সে যেন তার ডাক শুনতে পেল না। এক ঝটকায় গলিতে এল। ভেঙ্কটও যেন কোথা থেকে উদয় হয়ে তাকে ডেকে ফেরানের চেষ্টা করল। রাঘব রাও গলির পিচের রাস্তা দিয়ে প্রথমে ধীরে, তারপর উর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে তার মনে হল, সূর্যাপেট থেকেও সে পালাবে। তার গ্রামের মেয়েটি অন্ততঃ নিজের বুকের পবিত্রভাকে রক্ষা করেছিল, কিন্তু সূর্যাপেটের মেয়েরা সারা অঙ্গকেই বিক্রি করে দিয়েছে। তার মনে হল, এই সূটাপেটেও সে আর টিকে থাকতে পারবে না।

অন্ধ কুঠরীর অন্ধকারে রাঘব রাও তার আদর্শবাদী রোমান্টিক মনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটু মুচকি হাসল। যে আদর্শবাদী রোমান্টিকতা তাকে সূর্যাপেট থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। প্রথমে সে শ্রীপুরম থেকে সূর্যাপেটে পালিয়ে আসে। তারপর সূর্যাপেট থেকে হায়দ্রাবাদে। হায়দ্রাবাদে এসে সে রিকশা টানতে শুরু করে। কারণ তার ছু'বাহুতে ছিল অসাধারণ শক্তি, বুকে ছিল প্রত্যয় আর পায়ের পেশী ছিল দৃঢ় মজবুত। চড়াই উঠতে সে কখনও ক্লান্তি অনুভব করত না। আর অনায়াসে উত্তরাইয়ে নামতে পারত। প্রথম প্রথম কংক্রিটের এই সড়ক, বৈদ্যুতিক আলো তার খুব ভালো লাগত। আর রিকশার ঘণ্টা-ধ্বনি যেন তার কানে সঙ্গীতের স্বর হয়ে বেজে উঠত। রাত্রে ভর-পেট খাওয়ার পর মনে হত, তার

জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া যেন শেষ হয়ে গিয়েছে। রিকশার মালিক তাকে দুটি কামিজ দিয়েছিল। সেই কামিজ গায়ে চড়িয়ে সে সব কিছু ভুলে গেল। যেন এক তেজী, হৃষ্টপুষ্ট কুকুরের মতো সে হায়দ্রাবাদের রাস্তার ওপর দিয়ে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। সে যে একজন মানুষ—তাকে যে ঘোড়ার মতো জুতে দেওয়া হয়েছে, তা সে ভুলে গেল। ভুলে গেল, কিছু লোক রিকশায় চড়তে পারে, আর কিছু লোককে রিকশা চালাতে হয়। ভুলে গেল, সে এই হায়দ্রাবাদে কেন এসেছে।

দু'টি কামিজ দু বেলা দু'টুকরো রুটি আর কয়েকটা টাকা তার চোখের ওপর এক রঙিন স্বপ্ন বিছিয়ে দিল। যেদিন সে তার বাবা বিরাইয়াকে বিশ টাকা পাঠাল, সেদিন মনে হল, তার মতো ভাগ্যবান পুরুষ হায়দ্রাবাদে আর দ্বিতীয় জন নেই। আর, আর তাছাড়া বিড়ি, বিড়ির চেয়েও ভালো সিগারেট—মাংসের স্বাদ তো তুলনাহীন।

পাঁচ-ছ' মাস এই ঐশ্বর্য আর তৃপ্তি নিয়ে সে নিজেকে কাটিয়ে দিল। তারপর একদিন সে অসুখে পড়ল। প্রথম প্রথম ভেবেছিল, অসুখটা তেমন কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে বেশ শক্ত রোগে ধরেছিল। প্রথমে একদিন চড়াই উঠতে তার মাথা ঘুরে যায়। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সামলিয়ে নেয়। তারপর একদিন খুসখুসে কাশি শুরু হল। সঙ্গে ঘুসঘুসে জ্বর। মাস খানেকের মতো বিছানায় পড়ে রইল। অসুখের সময় রিকশার মালিক তাকে বেশ সাহায্য করেছিল। কারণ সে খুব তুখোড় রিকশা চালক। আর রাঘব রাও-এর হাতেও সঞ্চিত কিছু পয়সা-কড়ি ছিল। হাতে যা জমা ছিল, তা অসুখের সময় কাজে লেগে গেল। মাসখানেক পরে সে সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু দুর্বলতা থেকেই গেল। তবু সে আস্তে আস্তে রিকশা টানতে শুরু করে। রিকশা টানতে টানতে সে খুক খুক করে কাশত আর হাঁফিয়ে উঠত। ডাক্তার তাকে আরও মাস দুয়েক বিশ্রাম নিতে বলল। কিন্তু কাজ না করলে সে খাবে কি! তাই রিকশা তাকে চালাতেই হল। রিকশা টানতে টানতে তার দম ফুরিয়ে যেত—মাথা এবং সারা দেহ দিয়ে দরদর করে ঘাম ছুটত। হাত এবং পায়ের শিরা-

গুলো যেন ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসতে চাইত। আর বুকের ভেতর কাশি যেন কালো ধোঁয়ার মতো চক্কর কাটত। তা সত্বেও তাকে রিকশা না টেনে কোন উপায় ছিল না।

অন্ধকার আরও ঘনিভূত হল।

রাঘব রাও মুহূর্তখানেকের জন্যে থমকে যায়। তারপর আবার সে সেইসব মানুষের ভিড়ের মধ্যে তার দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়, যারা তার রিকশায় সওয়ার হত। এক আনা ভাড়া কম-বেশির জন্যে কেরানীরা ঝগড়া করত। জোরে রিকশা না ছোটালে ছাত্ররা মেজাজ দেখাত। আর রাত্রির অন্ধকারে গুণ্ডারা ছুরি নিয়ে ঘোরাফেরা করত। ব্যভিচারীরা সিনেমার পর্দা ছিঁড়তে এতটুকু কুণ্ঠিত হত না, অথচ রিকশায় চড়ে তারাই পর্দা নামিয়ে দিয়ে দেহ-পসারিনীদের জড়িয়ে ধরে প্রেম করত। রিকশা নিয়ে ছুটতে ছুটতে সে যখন খুক খুক করে কাশত, তারা অশ্লিল সব গালিগালাজ করত। কখনও কখনও বা রিকশা থেকে নেমে পয়সা না দিয়েই অন্য রিকশায় উঠে বসত। মৌল-বীরা পর্দা দিয়ে ঘিরে রিকশা ব্যবহার করত। খদ্দরধারীরা রিকশাকে পিকদানীর মতো আর বেনেরা মালগাড়ির মতো ব্যবহার করত। আর মেয়েরা রিকশাকে শিশুদের অনাথ আশ্রম বলে মনে করত। কত রকম মজার মজার মানুষের মুখের সঙ্গেই না রাঘব রাও রিকশা টানতে টানতে পরিচিত হয়েছে। গ্রামে থাকতে রাঘব রাও দুঃখকে বরণ করতে শিখেছিল। আর শহরে এসে সে অন্যকে দেখে মুচকি হাসতে—আর নিজেকে নিয়ে হাসতে শিখল।

রাঘব রাও এই তামাম ভিড়ের মধ্যে তার চোখ দুটি প্রসারিত করে দিল। আর সেই অজস্র মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিল। একদিন রাত্রে এই মানুষটি আবিদ আলি রোডে তার রিকশায় সওয়ার হয়েছিল। হাতে ছিল দুটি বই। গলায় ছিল আন্তরিকতার আভাস। যেভাবে ও রিকশা ডাকল তাতে না ছিল কোন অহংবোধ, না কোন ঘনিষ্ঠতার ছাপ। ওর ডাকের মধ্যে কী যেন

এক অদ্ভুত জিনিস ছিল। ভাড়া ও নিজেই ঠিক করল। ভাড়া কমও ছিল না, আবার বেশীও নয়। একেবারে ন্যায্য ভাড়া। তাই ভাড়া নিয়ে কোন দরকষাকষি হল না। রাস্তায় ছুটে চলার সময় সে একটিও কথা বলল না। সাধারণতঃ সওয়ারিরা রিকশাওয়ালাদের আজব আজব প্রশ্ন করে। ভুলে যায়, রিকশা নিয়ে ছোটার সময় রিকশাওয়ালার বুকে এত দম থাকে না যে, রিকশাও চালাবে, আবার প্রশ্নেরও জবাব দেবে। হয় সে সওয়ারির প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, না হয় রিকশা নিয়ে ছুটতে পারে। এদিক দিয়ে দেখলে বলতে হয় লোকটি মন্দ নয়—ভালোই।

প্রায় অর্ধেকটা পথ নীরবতার মধ্যে কেটে গেল। জিয়াই রোডের মোড়ে এসে সে খুব আস্তে বলল, 'আখতার রোডের দিকে চল।'

লম্বা চড়াইয়ে উঠতে রাঘব রাও-এর দম ফুরিয়ে এল। সে নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দে নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল। আর খক খক করে কাশির দমক উঠতে লাগল।

লোকটি খুব নরম স্বরে বলল, 'রিকশা থামাও।'

রাঘব রাও বলল, 'না সাহেব, চিন্তা করবেন না। এখনই ঠিক হয়ে যাবে। আমি আপনাকে ঠিক পৌঁছে দিতে পারব।'

লোকটি আন্তরিক অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'রিকশা থামাও।'

রাঘব রাও রিকশা থামায়। ভাবে, লোকটি হয়তো তাকে খিস্তি দেবে এবং ভাড়া না মিটিয়ে চলে যাবে। কিন্তু লোকটি সেরকম কিছুই করল না। বরং সে রাঘব রাও-এর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'চড়াইটা তুমি খালি রিকশা নিয়েই চল, চড়াই পার হয়ে গেলে রিকশায় উঠব।'

রাঘব রাও কৃতজ্ঞতায় লোকটির দিকে চেয়ে রইল। এতক্ষণে সে লোকটিকে ভালোভাবে দেখল। শ্যামবর্ণ মুখাবয়বের ওপর টানা টানা দুটি চোখ। আর সেই টানা টানা চোখ দুটিতে এক নতুন ধরনের সহানুভূতি এবং আত্মীয়তার আভাস সে দেখল।

লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কবে থেকে এমন কাশি হচ্ছে?'

—'প্রায় মাসখানেক।'

—'কোথায় থাক?'

—'গোবিন্দরামের কুঠিতে'

—'ইউনিয়নের মেম্বর হয়েছ?'

—'কি?' রাঘব রাও প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না।

আর কোন কথা না বলে, লোকটি রাও-এর সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলল। তারপর তার কাঁধে আস্তে বন্ধুর মতো হাত রেখে বলল, 'শহরে তোমার মতো আও রিকশাওয়ালা আছে। সবারই একই রকম দুরবস্থা। আর এই দুরববস্থার মোকাবিলার পথও একটি। রিকশাওয়ালারা তাদের নিজেদের ইউনিয়ন বানিয়েছে! ইউনিয়নে তারা একসঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করে।'

রাঘব রাও লোকটির দিকে সন্দেহ প্রবণ চোখ নিয়ে তাকাল। সূর্যাপেটের চাকরদের আড্ডাখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার খুব রাগ হল। এক ঝটকায় সে লোকটার হাত কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'না সাহাব, আমি কোন আড্ডাখানার মেম্বর নই, আর হতেও চাই না।'

লোকটি আর কোন কথা না বলে নীরবে বেশ খানিকক্ষণ রাঘব রাও-এর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। তারপর সে একেবারে অন্য ধরনের —একান্ত ঘোরায়া কথা বলতে শুরু করল। রাও-এর নাম, তার দেশ কোথায়। উতরাইতে রিকশা নিয়ে কীভাবে নামতে হয়, সস্তা খাবার কোথায় পাওয়া যায়। যে মালিক খোরাকি পোশাক এবং মাথা গোজার ঠাঁয় দেয়, সে রিকশাওয়ালাদের কাছ থেকে কতখানি মুনাফা ওয়াশিল করে নেয়—ইত্যাদি। রাঘব রাও-এর কাছে এই ঘরোয়া কথাগুলোর দাম অনেক। সে খুব মন প্রাণ দিয়ে কথাগুলি শুনছিল। পথ চলতে চলতে জানতেই পারেনি, কখন সে চড়াইটা পার হয়ে এসেছে। কথা বলতে বলতে রাঘব রাও সেই লোকটির বাড়ির দোর গোড়ায় পৌঁছে গেল। এতটা পথ কিন্তু লোকটি এক মিনিটের জন্যেও রিকশায় ওঠেনি।

বাড়িতে পৌঁছে লোকটি রাঘব রাওকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল, 'এক কাপ চা খেয়ে যায়।'

রাঘব রাও চা খেতে চাইল না।

—'না, না, এস ঠাণ্ডার সময় চা খেলে শরীরটা গরম এবং চাঙ্গা হয়ে উঠবে।' বলে লোকটি রাঘব রাও-এর হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল।

রাঘব রাও দেখল, ঘরটা তেমন বড় নয়—ছোটখাটো, কিন্তু বেশ ছিমছাম। মাত্র দুটি কামরা। একটি কামরায় সে তখন দাঁড়িয়ে। আর একটি অন্দর মহল। দুটো কামরার মাঝখানে ফুলতোলা একটা পর্দা ঝুলছে। বাইরের ঘরে তিনটে চেয়ার, চেয়ারগুলির ওপর গদি। মেঝের ওপর সবুজ রঙের সতরঞ্চি পাতা। আর চারদিকে কাঠের তাক, তাতে থরে থরে বই সাজানো। ঘরের চারদিকে চোখ বোলাতেই, ফুলতোলা পর্দা সরিয়ে এক দীঘল ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকল। আর তার পেছনে দৌড়তে দৌড়তে ছোট্ট একটি মেয়ে সেই লোকটির —যে তাকে এখানে এনেছে, তার হাঁটু দুটো তার ছোট ছোট দুটি হাতে জাপটিয়ে ধরল।

লোকটি মিষ্টি হেসে রাঘব রাওকে বলল, 'আমার নাম মকবুল। এ হচ্ছে আমার স্ত্রী, আর এটি আমার মেয়ে—আমিনা।' তারপর সে আমিনাকে কোলে নিয়ে বলল, এ হচ্ছে আমার কমরেড রাঘব রাও। একে লাল সালাম কর। ওর কোলে যাও মামনি।'

রাঘব রাও বিহ্বল হয়ে আমিনা মকবুল আর মকবুলের স্ত্রীর দিকে তাকায়। তাদের প্রত্যেকের চোখে ও এক অপূর্ব স্নেহ আর মমতা দেখতে পায়। এমন এক গভীর সহানুভূতি আত্মীয়তা আর সহজ স্বাভাবিক হাসি তাদের সমস্ত মুখাবয়বে উদ্ভাষিত হয়ে উঠেছিল, এর আগে তা সে কোথাও কোনদিন দেখেনি। এই মুখগুলোর ওপর বিস্ময়ে ও এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নেয়। কিন্তু বুঝতে পারে না লাল সালাম কাকে বলে। উচ্ছসিত মুখগুলো দেখে সে শুধু এতটুকুই

অনুমান ও উপলব্ধি করতে পারল, লাল সালাম নিশ্চয়ই ভালো কোন কিছু। তাই সে আমিনাকে দোলতে দোলাতে বলল, 'লাল সালাম।'

আমিনা খিল খিল করে হেসে উঠল। মকবুলের স্ত্রীও হাসল। মকবুলও হেসে গদিওয়ালা চেয়ারে বসে বলল, 'কমরেড, আজকে এখানেই খাবে।'

রাঘব রাও অবাক হয়ে মকবুলের দিকে তাকায়। কিন্তু কোন কথাই বলতে পারে না।

মেঝের ওপর বিছানো শতরঞ্চির ওপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চীনামাটির থালায় সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করল। আমিনা রাঘব রাও-এর কোলে বসেছিল। কী সুন্দর আবদার করেই না সে রাঘব রাও-এর কাছে খাবার চাইছিল, যেমনটি ভাবে সে ছোট বেলায় তার বাবার কাছে চাইত। ওর খুদে খুদে হাত নেড়ে আবদার কী ভালোই না তার লেগেছিল। মকবুলের স্ত্রী সুরাইয়া বারবার তার প্লেটে আন্তরিকতার সঙ্গে ভালো ভালো মাংসের টুকরো তুলে দিচ্ছিল। আর মকবুল নীরবে খেয়ে চলেছিল।

রাঘব রাও মকবুলকে অনেক—অনেক কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাইল—কমরেড কাকে বলে?—লাল সালামের মানে কি? সবচেয়ে বেশী করে জানতে ইচ্ছে করছিল, এই প্রীতি এবং সহৃদয়তার অর্থ কি?

খাওয়া-দাওয়ার পর সুরাইয়া দস্তরখান তুলে রাঘব রাও-এর জন্যে গরম গরম এক পেয়ালা কোকো নিয়ে এল।

কোকো খেয়ে রাঘব রাও মকবুলের দিকে উৎসুক ভাবে তাকাল। কিছু একটা বলার জন্যে সে যখন মুখ খুলছিল, ঠিক তখনই মকবুল তাকে বলল, 'যতদিন তোমার কাশি না কমছে, ততদিন রাতে তোমার কাজ না করাই ভালো।'

রাঘব রাও কোন উত্তর দিল না।

মকবুল বলল, 'আমাদের ইউনিয়নে একজন ডাক্তার আছেন। তুমি তাঁর কাছে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাতে পার।'

রাঘব রাও চুপ করে রইল।

—'এত ঠাণ্ডায় তুমি বাইরে গিয়ে কি করবে? এখানেই রাতটা কাটিয়ে দাও।'

রাঘব রাও হঠাৎ মকবুলকে জিজ্ঞেস করল, 'কমরেড কি?'

মকবুল চেয়ার ছেড়ে ধীরে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সুরাইয়াকে বলল, 'সুরাইয়া, কমরেড আজ এখানেই শোবে।'

সুরাইয়া অন্দর থেকে একটা তোষক এনে সতরঞ্চির ওপর পেতে দিল। আর মকবুল বই-এর তাক থেকে একটা বই বেছে নিয়ে রাঘব রাও-এর পাশে এসে বসল।

রাঘব রাও উৎসুকতার সঙ্গে বই-এর পাতা স্পর্শ করে। মকবুল বইটা রাঘব রাও-এর হাতে দেয়। রাঘব রাও বই-এর পাতাগুলোর ওপর হাত বোলাতে থাকে। কোন অক্ষরই সে চেনে না। কিন্তু পাতাগুলো স্পর্শ করতে করতে তার মনে হল, তা যেন রেশমের মতো নরম। তারপর সে আলতো ভাবে বইটি মকবুলে হাতে দেয়।

মকবুল বইটা মেলে ধরে। একটা পাতার ওর বিশ্বের মানচিত্র। মানচিত্রের যে জায়গায় ভারতবর্ষ, তার ওপর আঙ্গুল রেখে মকবুল বলল, 'এ হচ্ছে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ—হিন্দুস্তান।' তারপর হিন্দুস্তানের উত্তরে অবস্থিত একটি দেশের ওপর আঙ্গুল রেখে বলল, 'আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এখানেও আমাদের দেশের মতো গোলাম ছিল···।'

পাঁচ

রাত্রি আরও গভীর হয়ে ঘনিয়ে এল। গল্পটা দীর্ঘ, কিন্তু এই রাত্রির এক একটি মুহূর্ত এবং এই গল্পের এক একটি শব্দ রাঘবের রাও-এর কাছে ছিল এক অমূল্য সম্পদ। চুন্দরীর পবিত্র বুকে নতুন বসন্তের যে সবুজ বাহার সে দেখেছে, তার ঝিলিক যেন এই শব্দসম্ভারের মধ্যে সে অনুভব করতে থাকে। নিজের অন্তরে সে যে শতাব্দীর অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে এসেছিল, তা যেন সে এখানে খুঁজে পায়। গড়ের যে ঐশ্বর্যময় তোরণ ওর মাথাকে অবনত করে দিয়েছিল, তার চেয়েও অনেক-অনেক বড় তোরণ যেন গোলামরা তাদের বাহুবল দিয়ে অবনত করে দিয়েছে। যে এক একটি শব্দ মকবুলের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল তা যেন রাও-এর অন্তরকে স্পর্শ করছিল। আর মাঝখানে এমন কোন শক্তি ছিল না যা তাকে প্রতিরোধ করতে পারে। রাঘব রাও এক একটি দিশার জ্ঞান অর্জন করছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দিশার পথও ভেসে উঠছিল। আগে যার অর্থ তার জানা ছিল না, আজ তার অর্থ সে বুঝতে পারে। যেখানে ছিল এক অন্ধ অনুভব—অন্ধ আক্রোশ, সেখানে আলোর তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যেখানে অনুভূতির কোন কুল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেখানে সে পেল শক্ত মাটির স্পর্শ। রাঘব খুব দৃঢ়তার সঙ্গে সেই মাটিতে পা রাখে এবং আপন মনে বলে,—আমি তরুণ, আর যা শুনছি তাও তারুণ্যে ভরপুর, তাই বীজও বোনা হবে আর ফসলও কাটা হবে।

রাঘব রাও আজ পর্যন্ত জানে না, সেই রাত্রে কতক্ষণ পর্যন্ত এই গল্প চলেছিল। কতক্ষণ পর্যন্ত ও জেগেছিল আর কখনই বা ঘুমিয়ে পড়েছিল। শুধু এটুকুই তার মনে আছে, সে আর মকবুল দুজনেই লেপ গায়ে দিয়ে শুয়েছিল। সে শুনছিল আর মাকবুল বলে

চলেছিল। আর পাশেই মেঝেতে সুরাইয়া শুয়ে। সুরাইয়ার পাশে শুয়ে তার ছোট্ট আমিনা, হাল্কা হাল্কা তার নিঃশ্বাসের শব্দ বয়ে চলেছিল। তার ছোট্ট হাতখানা বিছানার বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। ঘরের টেবিল ল্যাম্পের সাদাটে আলো দেয়ালের ছায়ায় থরথর করে কাঁপছিল।

এরপর তার আর মনে নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। শুধু এতটুকুন মনে আছে, গভীর রাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। দেখে তার পা লেপের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। আর সুরাইয়া তার পায়ের ওপর লেপ টেনে দিচ্ছে। লেপ দিয়ে তার পা ঢেকে দেওয়ার সময় সুরাইয়ার আঙ্গুলগুলো রাঘব রাও-এর পায়ে ঠেকে যায়। আঙ্গুল-গুলো যেন তার কোন্ কোমল ভাবনাগুলোকে স্পর্শ করে। তার চোখ জলে টলমল করে ওঠে। সে তার ছলছল চোখে দেখল, সুরাইয়া তার বিছানা থেকে মকবুলের বিছানায় গিয়ে লেপ ঠিক করে দিচ্ছে। তারপর মেয়ের চাদরের ভাঁজ সটান করে দিচ্ছে। এরপর নিশ্চিন্ত মনে সুরাইয়া আমিনার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে শুয়ে পড়ল। রাঘব রাও-এর চোখ জলে ভরে ওঠে। কিন্তু রাঘব রাও এই অশ্রু মোছে না। কারণ এ ছিল তার আনন্দের অশ্রু। মনে হয়েছিল সে যেন আজ তার নিজের ঘরেই এসেছে।

ছয়

কয়েক মুহূর্তের জন্যে রাঘব রাও এই সুন্দর ছবিটির ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। কিন্তু হঠাৎ কে যেন তার চিন্তার শৃঙ্খলরাজিকে খান খান করে ভেঙে দিয়ে গেল। প্রথমে শেকলের ঝনঝন আওয়াজ, তারপর অন্ধ কুঠরীর দরজা খোলার শব্দ কানে এল। তবু রাঘব রাও নিজের জায়গা থেকে এতটুকু সরল না—অবশ্য নড়া তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তারপর মাটির ওপর সে ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পেল এবং ওয়ার্ডার এসে তার হাতকড়ি খুলে দিল। জেলের সুপারিন-টেনডেন্ট তাকে দাঁড়াতে বলল। রাঘব রাও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়ানোর যে আনন্দ, সেই আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে তার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হল। কিন্তু পর মুহূর্তেই ডাণ্ডাবেড়ি হাঁটুর সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে হাঁটুর ঘাঁয়ের ব্যথা তীব্র করে তুলল। কিন্তু তা সত্বেও সে সোজা হয়েই দাঁড়াল।

সুপারিনটেনডেন্টের হাতে একটা ময়লা কাগজ তাঁর হাত কাঁপছিল। রাঘব রাও দেখল, হুকুমনামা পড়িয়ে শোনানোর সময় তাঁর ভাব-লেশহীন মুখের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম চিকচিক করছে। হুকুমনামায় রাঘব রাও-এর আবেদনকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ডকে ন্যায় সঙ্গত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কালকে ভোর সাতটায় তাকে ফাঁসী দেওয়া হবে।

সুপারিনটেনডেন্ট রুমাল দিয়ে তাঁর মুখ মুছে বন্দীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কোন বক্তব্য আছে?'

প্রশ্নের উত্তরে রাঘবের-এর মুখে ফুটে উঠল শুধু একটু মুচকি হাসি।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে সুপারিনটেনডেন্ট রাঘব রাও-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই প্রথম তিনি এ ধরনের একজন বন্দী দেখলেন।

তিরিশ বছর চাকুরীর জীবনে তিনি অনেক রকম বন্দী দেখেছেন—এক থেকে এক দুর্দান্ত ডাকাত—যারা ফাঁসীকে ভয় পায় না। কিন্তু ফাঁসীর আদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে জজকে কদর্য গালিগালাজ দিতে শুরু করত। এমন বন্দীও দেখেছেন, যারা কাঁদত, পেচ্ছাব করে ফেলত, অজ্ঞান হয়ে যেত, কামড়ানোর জন্যে পাগলের মতো ছুটে আসত এবং করজোড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। কিন্তু এমন বন্দী তিনি কোনদিন দেখেননি, যে ফাঁসীর আদেশ শুনে এমন নিঃশব্দে হাসতে পারে। তিনি ঘুরে ঘুরে বন্দীকে দেখতে লাগলেন—হয়তো এই হাসির পেছনে লুকিয়ে আছে কোন ভয়, কোন লালসা, কোন সুপ্ত দুর্বলতা। কিন্তু সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের দেখার সেই চোখই ছিল না। সারা জীবন ধরে তিনি শুধু অপরাধীদের চেহারার অর্থই পড়েছেন। একজন মানুষের চেহারা তিনি কিভাবে পড়বেন ! মনে মনে বেশ কিছুটা লজ্জিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে সুপারিনটেনডেণ্ট অন্ধ কুঠরী থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

সুপারিনটেনডেণ্ট চলে যাওয়ার পর ওয়ার্ডার দুজন অনেকক্ষণ নির্বাক এবং নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিজেদের মধ্যে মিনমিন করে কথা বলতে লাগল। অবশেষে তাদের মধ্যে যে বয়ঃবৃদ্ধ সে সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'আমাদের ওপর অর্ডার আছে তোমাকে হাতকড়ি পরিয়ে রাখার। কিন্তু আমরা তোমাকে বেঁধে রাখতে চাই না। তোমার হাতে হাতকড়া পরাবো না, তুমি কুঠরীর মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পার।'

রাঘব রাও বলল, 'তোমাদের চাকরীর কোন ক্ষতি হয় তো তোমরা আমাকে বেঁধেও রাখতে পার।'

দু' জন ওয়ার্ডারই বলল, 'না, আমাদের এ নিয়ে কোন ভয় বা ভাবনা নেই।'

রাঘব রাও চুপ করে থাকে।

তারপর বৃদ্ধ ওয়ার্ডার এগিয়ে এসে খুব আস্তে বলে, 'বেটা, তুমি কিছু খেতে চাও ? সরবৎ ? আমাকে বল। নিয়ে আসব।'

'না, আমার কিছু দরকার নেই। শুধু এইটুকু বল এখন কটা বাজে?'

বৃদ্ধ ওয়ার্ডার বাইরে গোলাম-গর্দিশে গিয়ে ঘড়িটা দেখে বলল, 'এখন পাঁচটা বাজে।' সামনে সারাটা রাত পড়ে আছে। রাঘব রাও মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। দুজন ওয়ার্ডারই মাথা ঝুঁকিয়ে বেরিয়ে যায়। আবার শেকলের শব্দ—অন্ধ কুঠরী বন্ধ হয়ে যায়। তালা লাগানোর শব্দ হয়—যেনবা কোন গভীর ইঁদারায় ভারি পাথর পড়ার শব্দ হল। তারপর নেমে এল এক গভীর—এক পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা।

রাঘব রাও পা ফাঁক করে অন্ধ কুঠরীর মধ্যে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল—যাতে হাঁটার সময় ডাণ্ডাবেড়ি তার হাঁটুর ঘাঁয়ে না লাগে। চার কদম শুধু এগুনো পেছনের জায়গা—তার পরেই দেয়াল। চার দেয়ালের মাঝে শুধুমাত্র চার কদমের ফারাক—এক দুই তিন চার—এক দুই তিন চার। চার কদম চলার পরেই ওকে থেমে আবার পেছনে ঘুরতে হচ্ছিল। এই অন্ধ কুঠরীতে ও পা টান করেও শুতে পারে না। রাঘব রাও এক নতুন বিস্ময় নিয়ে তার দেহের দিকে তাকায়—নিজের বাহু পা এবং বুক দেখে। নাক কান এবং মুখের ওপর হাত বোলায়। সমস্ত কিছু আগের মতোই যথাস্থানে আছে। সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত। দেহে আছে উষ্ণতা। সে জীবিত—শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে, ছটফট করছে। আগামীকাল এই উষ্ণতা এই ছটফটানি, বুকের ধরফরানি, অনুভূতির টানাপোড়ন চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কেন? মৃত্যুকে সে ভয় করে না। জন্ম গ্রহণ, বড় হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া এবং পরিবর্তিত হয়ে স্বপ্নের মতো সুন্দর ছক পরিগ্রহ করা এবং ধীরে ধীরে ঝরা পাতার মতো বার্দ্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া, অবশেষে এক নতুন জীবনের উন্মেষ দেখা, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে মৃত্যু নয়, জীবনের সৃষ্টিশীল সৌন্দর্যের এক অবিরাম নৃত্য সে দেখতে পায়। কিন্তু আগমীকালের যে মৃত্যু, সে মৃত্যু কি রকম? সে এখনও বৃদ্ধ হয়নি। এখনও তার দেহে পাতা ঝরার কোন চিহ্ন নেই। ফুলের কুঁড়ি এখনও ফোটেনি, ফুল

খিলখিল করে হেসে তার পাপড়ি খোলেনি, আজও বর্ষা হয়নি, রামধনু এখনও ওঠেনি ; বুলবুলি শিষ দেয়নি, আর বুলবুলি শিষ না দিলে গাছের জীবনও যে পরিপূর্ণতা লাভ করে না।
তবে কি জন্যে এই ভরাট যৌবনে তার মৃত্যু নেমে এল।

রাঘব রাও অন্ধ কুঠরীর ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে মেঝের ওপর পা ভাঁজ করে বসে। থুতনিটা ডাণ্ডারেড়ির ওপর রেখে চিন্তা করতে থাকে··· মকবুল ওকে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছিল—লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তার ফুসফুস নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল বলে মকবুল তার রিকশা চালানো বন্ধ করে দেয়! সে তাকে একটা কাগজের মিলে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল। মকবুলের কাছে সে যা-যা শিখেছিল, মিলে ঢুকে সেসব কিছু যাচাই করার সুযোগ সে পেল। মিলে ঢুকে সে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র এবং চারদিকে প্রসারিত জাল বিছানো দেখল—যে ষড়যন্ত্র এবং জাল ভারতবর্ষের শহরের পুঁজিপতি এবং গ্রামের জমিদাররা ছড়িয়ে দিয়েছে। যার অজস্র তন্ত্রী জীবনের স্তরে স্তরে বিষের ফল্গুধারার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। সে দেখেছিল, এখানে প্রতি পদক্ষেপে নতুন জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে—অবস্থার রূপান্তর ঘটানোর জন্যে, মানুষকে আরও মহান করে তোলার জন্যে পুরনো জীবনের সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়াই করতে হয়। মিলে গিয়েই রাঘব রাও লড়াই করতে শেখে, কারণ এখানেই সে নব জীবনের সেই কারিগরদের দেখে, যাদের হাতের যাদুতে পুরনো কাঠের টুকরো এবং ছেঁড়া-ফাটা পচা কাগজ রূপান্তরিত হয়ে জন্ম নিচ্ছে এক সুন্দর নতুন কাগজ! প্রানহীন-নির্জিব লোহাও তাদের হাতের স্পর্শে হৃদয়ের মতো স্পন্দিত হয়ে ওঠে আর সেই লোহা গলিয়ে তৈরি হয় কৃষকের হাল মোটরের যন্ত্রপাতি এবং ফুলের মালা গাথার সূচ। নবজীবনের এই কারিগরদের দেখে ভূগর্ভে প্রোথিত সেই হাজার হাজার বছরের অতীতকে তার মনে পড়ে, যে অতীত কয়লাতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। সেই যুগ-যুগান্তের কথা, যা আজ লোহার গলিত ধাতুতে রূপান্তরিত হয়েছে, মনে পড়ে যায় সেই সৌন্দর্যের কথা, যে সৌন্দর্য রেডিয়ামে জমাট বেঁধে গিয়েছে।

এসব ও যখন বুঝতে শিখল, তখন গর্বে ওর মাথা উঁচু হয়ে উঠল। দৃঢ়তার সঙ্গে সে তার সাথীদের হাত চেপে ধরত, কারণ এই হাত-গুলোই মাটির নীচের খাজাঞ্চীখানকে অন্ধকার গহ্বর থেকে তুলে আনতে পারে এবং মানুষের জীবনকে করে তুলতে পারে আরও সুন্দর এবং সুষমামণ্ডিত। সে এই হাতগুলো আর কখনই ছেড়ে দেবে না, এই হাতগুলো তো ভবিষ্যত ধ্বংসকারী মুনাফাখোরদের হাত নয়—এ হাত শ্রমিকদের—নবজীবনের নির্মাতাদের।

মিলের এক বছরের চাকুরী জীবনে রাঘব রাও অনেক কিছু শিখে গিয়েছিল। অন্য কোথাও দশ বছর লড়াই করেও সে বোধহয় তা শিখতে পারত না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করা, পরাজিত হয়েও হতাশ না হওয়া এবং হরতাল করে সংগ্রামকে কীভাবে এগিয়ে নিতে হয়, সে শিখল। মালিকের গুণ্ডাদের সঙ্গে হামেশাই এখানে সংঘর্ষ বাঁধত। আর এই গুণ্ডাদের যে স্বভাব, সেই স্বভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল তাদের মনোভাব এবং উদ্দেশ্য। যে একই ধরনের মনো-ভাব এবং উদ্দেশ্য সে গ্রামের দেশমুখদের গুণ্ডাবাহিনীর মধ্যেও দেখেছে। কিন্তু এখানে এই গুণ্ডাদের যে দাওয়াই হত, তা গ্রাম থেকে অনেক সহজ ব্যাপার! তা সত্বেও, কয়েকবার তার ওপর হামলা হয়েছে—লাঠি এবং ছুরির মুখোমুখি হতে হয়েছে, মিল থেকে বরখাস্ত হয়েছে, ছ'মাস জেল খাটতেও হয়েছে।

জেলখানায় তাদের গ্রামের গোয়ালা নাগেশ্বরের সঙ্গে তার দেখা হয়। নাগেশ্বরকে দেখে রাঘব রাও চমকে ওঠে। কিন্তু রাঘব রাও-এর এই বিস্ময়ভাব নাগেশ্বর অচিরেই দূর করে দেয়। নাগেশ্বর তাকে বলল, শ্রীপুরম এখন আর সেই আগের গ্রাম নেই। সেখানেও জীবনের গতিমুখ পালটাতে শুরু করেছে। বছরের পর বছর—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নির্যাতিত নিপীড়িত গোলামরা খেতমজুররা গোয়ালারা জঙ্গলের অধিবাসী কোয়াররা অর্থাৎ গ্রামের সমস্ত জমি জোত হারানো—নিঃস্ব মানুষরা জোট বেঁধেছে—তাদের নিজেদের

সমিতি গড়ে তুলেছে। সবাই একাট্টা হয়ে চল্লিশটি গ্রামের জমির একচ্ছত্র মালিক সেই জগন্নাথ রেড্ডির কাছে তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী করেছে। আর এ নিয়ে প্রতিদিন চলেছে লড়াই-মার-পিট। গোলামরা গ্রেফতার হয়েছে। তাদের ওপর চলছে নানান ধরনের জুলুম আর অত্যাচার। যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত—লুণ্ঠিত গোলামরা আজ যেন সিংহের মতো উঠে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন জায়গায় জমিদারদের হুকুম না নিয়েই গোলামরা জমি জুততে শুরু করেছে। আর এই অপরাধেই নাগেশ্বরকে গ্রেফতার করে কয়েদ-খানায় পাঠানো হয়েছে।

ঘটনা শুনে রাঘব রাও অবাক হল। সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে সে ডগমগ হয়ে উঠল। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, জঙ্গলের অধিবাসী কোয়াররা—যারা সারা জীবনভর অত্যাচারই সয়ে এসেছে, তাদের বুকে এত সাহস লুকিয়ে আছে! হাজার হাজার বছরের গোলামীর শেকল ছিঁড়ে মুহূর্তের মধ্যে মানুষ যে মানুষ হয়ে উঠতে পারে এ যে এক অসম্ভব ব্যাপার।

নাগেশ্বর বলল, 'কোয়াররাই তো এই আন্দোলনের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের একতা দেখলে অবাক হয়ে যাবে। আর আমাদের গোয়ালারা তোমাদের গোলামদের চেয়েও এগিয়ে আছে। গোয়ালাদের তুমি কি মনে কর?'

নাগেশ্বর হাসল। হাসতে হাসতে নিজের মাথার ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিল। তারপর হঠাৎই তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠে।

রাঘব রাও জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার নাগেশ্বর?'

নাগেশ্বর মাথা হেট করে কপাল থেকে মাথার তালু পর্যন্ত প্রসারিত একটা ক্ষত-চিহ্ন দেখাল। গভীর আর দীর্ঘ ক্ষত। যেন কেউ ছেকা দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। রাঘব রাও দেখল, সত্যি সত্যি সেই দীর্ঘ ক্ষত জুড়ে একটিও চুল নেই।

রাঘব রাও উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবে হল?'

—আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জমিদার তার আস্তাবলে বন্ধ করে

রেখে দেয়। আর সবার কাছ থেকে আমাকে আলাদা করে রাখে ; দু দিন কিছু খেতে দেয় না। তারপর বেদম পেটায়। কিন্তু আমি আমার সাথীদের নাম বলিনি। ওরা তখন আমার মাথার এখানকার চুল পুড়িয়ে দেয়। পুড়িয়ে দিয়ে একটা ধারালো খুরপি দিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়। ওরা আমার চামড়া চাড়াচ্ছিল, আর সমানে হাসছিল। হাসতে হাসতে বলছিল, 'তোর মাথার ওপর আমরা মস্কো রোড বানাচ্ছি। এই রাস্তা দিয়ে তুই সোজা মস্কো যেতে পারবি, বুঝলি।' যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

নাগেশ্বর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। রাঘব রাও-ও কোন কথা বলতে পারল না।

অবশেষে নাগেশ্বর তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে অদ্ভুত এক গাম্ভীর্য নিয়ে রাঘব রাওকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, মস্কো কোথায় ?'

রাঘব বলল, 'মস্কো কোথায় তুমি জান না ?'

নাগেশ্বর মাথা নাড়িয়ে বলল, 'না, ভাই।'

রাঘব রাও বলল, 'মস্কো একটা শহরের নাম।' একটুখানি থেমে সে আবার বলল, 'মস্কো একটা চিন্তাধারাও বটে।'

নাগেশ্বর কিছু বুঝতে পারল না। হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি লেখাপড়া জানি না। জঙ্গলের গোয়ালা। শুধু এটুকু জানি, আমি আমার জীবনে, আমার জীবনেই বা বলব কেন,—আমার বাবা, বাবার বাবাদের সাত জন্মেও কেউ কোন দিন জমি দেখেনি। আর এখন, আমাদের জমি পাওয়ার এই যে তীব্র আকাঙ্খা, সেই আকাঙ্খা প্রাণ থাকতে কি করে ছাড়ি ?'

রাঘব রাও বলল, 'এই আকাঙ্খা—এই আশার নামই মস্কো।'

নাগেশ্বর বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'এই আশা—এই আকাঙ্খার নাম যদি মস্কো হয়, তবে আমার মাথার এই ক্ষতচিহ্ন তাই-ই হোক। ওরা যদি ফের চায়, শুধু আমার মাথায় কেন, সারা শরীরে মস্কো রোড

বানিয়ে দিক। হাজার যন্ত্রণা সত্বেও এই আশা—এ আকাঙ্খাকে আমি আঁকড়ে ধরে থাকব।'

রাঘব রাও সজোরে নাগেশ্বরের হাত চেপে ধরে বলল, 'জেল থেকে বেরিয়ে আমি তোমার সঙ্গে আমাদের গ্রামে যাব।'

কিন্তু রাঘব রাও যেদিন ছাড়া পেল, নাগেশ্বর সেদিন ছাড়া পেল না। তখন তার আরও পনেরো দিন জেলের মেয়াদ বাকি। তাই রাঘব রাওকে একাই নিজের গ্রামে যেতে হল। মকবুল আর অন্য সাথীরা জেল গেটে তাকে স্বাগত জানাল। রাঘব রাও মকবুলকে বলল, সে তার গ্রামে যেতে চায়। ওর প্রস্তাবে মকবুল খুশিই হল। মকবুলও ভেবেছিল, রাঘব রাও-এর এখন উচিত, তার গ্রামে ফিরে গিয়ে কৃষক আন্দোলনে সামিল হওয়া। কারণ অবস্থা খারাপের দিকে। মকবুল বলল, কৃষকদের এই আন্দোলনের জোয়ারকে শুধু নিজাম শাহীর পুলিস বাহিনীর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। তাই নিজাম শাহীর পুলিস এবং রাজাকাররা যৌথভাবে জগন্নাথ রেড্ডির এলাকায় দমন-পীড়ন চালাচ্ছে।

রাঘব রাও বলল, 'কিন্তু জগন্নাথ রেড্ডি তো হিন্দু আর রাজাকারদের সংস্থা হচ্ছে মুসলমানদের। এ দু' বিপরীতের মিলন হল কিভাবে?'

মকবুল বলল, 'মুনাফাখোর আর অত্যাচারীদের কোন ধর্ম-টর্ম নেই। আর আমাদের দেশের রেওয়াজ হচ্ছে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো পরাজিত হতে থাকলে তারা সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেয়।'

চলতে চলতে মকবুল রাওকে কয়েকটা ঠিকানা বলে দিল, পথে এই সব ঠিকানায় ও যাতে থাকতে পারে এবং তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারে। কারণ স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে এরা সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল। ঠিকানাগুলো নিয়ে সে মকবুল এবং অন্য সাথীদের বুকে জড়িয়ে ধরে। তারপর নিজের গ্রামের দিকে রওনা হয়।

সাত

রাঘব রাও যতই হায়াদ্রাবাদ থেকে দূরে গ্রামের দিকে এগুতে লাগল, ততই সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং হতাশার ক্রমবর্দ্ধমান চিহ্ন চোখে পড়তে লাগল। হায়দ্রাবাদের কাছাকাছি কিছু গ্রামে কিসানদের কাজ করতে দেখে। কিন্তু যতই হায়দ্রাবাদ থেকে দূরত্ব বাড়তে থাকে ওর সামনে প্রসারিত দৃশ্যপটে মানুষের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হতে দেখছিল। শুধু নিম আর পিপুলের গাছ বজরার খেত সৈলুর ঝোপ কিকর গাছের ওপর পরগাছা ছেয়ে গিয়েছে। আর পথের এখানে-ওখানে টিলার ওপর এক একটি কালো পাথরের ওপর আর একটি কালো পাথর, তারপর আর একটি—এমনভাবে সাজানো ছিল যেন কোন দানব-শিশু খেলতে খেলতে একটার ওপর আর একটা রেখে গিয়েছে। এসমস্ত কিছুই ছিল তার চির পরিচিত দৃশ্যাবলীর টুকরো টুকরো ছবি। কিন্তু যারা খেতে বজরা রোপণ করেছিল, খেতের আলে গাছ পুঁতেছিল কুয়ো খুঁড়েছিল আর খেত আর গাঁয়ের মাঝে পায়ে-চলা পথ বানিয়েছিল—অর্থাৎ সেই প্রাণী, যাদের নিবিড় অস্তিত্বে ভূমণ্ডলে স্পন্দন, প্রকৃতিতে সৌন্দর্য এবং অবস্থা ও পরিবেশের রূপান্তর সাধিত হয়—তাদেরই চোখে পড়ল না। দৃশ্যপট সেই একই রকম—সেই একই রঙ, সেই একই পরিবেশ—যা ওর শৈশব থেকে বিরাজিত হয়ে আছে। কিন্তু তবুও না-জানি কেন প্রতিটি জিনিস কেমন পরিপূর্ণতা-হীন আর তাতে নেই কোন প্রাণের উচ্ছল চিহ্ন। কে যেন দৃশ্যপটের বুকে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে দিয়েছে। বারবার রাঘব রাও-এর দুটি চোখ সেই দৃশ্যপটের ওপর গেড়ে বসতে লাগল। আর সে বারবার আঁতি-পাতি করে খুঁজতে লাগল সেই নির্ভেজাল—খাঁটি জিনিসটিকে। কিন্তু সেই খাঁটি—নির্ভেজাল জিনিসটি যেন কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে।

করিমনগর গ্রামের ইয়াল্লা রেড্ডির সঙ্গে তার দেখা করার কথা।

কিন্তু গ্রামের কাছাকাছি এসে সে দেখতে পেল সারা গ্রামখানি আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ-ষাটটি বাড়ি ছিল। কিন্তু সবগুলোই পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে। খড় আর নারকেল পাতা দিয়ে যে বাড়িগুলো ছাওয়া ছিল, সেগুলো পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র কয়েকটা বাড়ির মাটির দেয়াল কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে।

ইয়াল্লা রেড্ডির বাড়িটা ছিল একতলা—কাঁচা মাটি দিয়ে তৈরি। তবে আর দশটা বাড়ির চেয়ে এই বাড়ির হাল অনেকটা ভালো। বাড়ির দেয়ালগুলো ধ্বসে মাটির সঙ্গে মিশে যায়নি। কারণ ইয়াল্লা রেড্ডি গ্রামের অন্যান্যদের চেয়ে কিছুটা অবস্থাপন্ন।···বাড়ির দেয়াল-গুলিই কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা হাট খোলা। শাহাবাদী পাথরে বাঁধানো উঠোন। তার উঠোনের পাশেই নর্দমা। নর্দমার ওপর বড় বড় দুটি পাথরের চাঁই। তার ওপর জলের একটা ঘটি উলটে পড়ে আছে। উঠোনের মাঝখানে পড়ে রয়েছে ইয়াল্লা রেড্ডির মৃতদেহ। দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন। ইয়াল্লা রেড্ডি চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে। রাঘব রাও যতক্ষণ উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল, ততক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো ইয়াল্লা রেড্ডির খোলা চোখের দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক কষ্টে জোর করে সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর মাথা নীচু করে ধীর পদক্ষেপে সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে।

ইয়াল্লা রেড্ডির জন্যে রাঘব রাও মকবুলের কাছ থেকে একটা খবর নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তাকে আর সে খবর দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয়নি। ইয়াল্লা রেড্ডি স্বয়ং এই খবরের এক-একটি অক্ষর জীবন দিয়ে পালন করে দেখিয়ে দিয়েছে।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে ও বোধন বনের দিকে চলল। রাস্তায় পোড়া বজরার অনেক খেত দেখতে পেল। এবং ঝোপের কাছে একটি যুবতীর মৃতদেহ পড়ে ছিল। মৃতদেহটি একটি শিয়াল খাচ্ছিল। পায়ের শব্দ পেয়ে শিয়ালটা পালিয়ে গেল। পাথরের চাঁইগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হওয়ার সময় পাথরগুলো গড়িয়ে পড়ল। শিয়ালটা

টিলা টপকিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। রাঘব রাও মৃতদেহটি উঠিয়ে খেতের আলের ওপর রাখল। এবং আল ভেঙে তার মাটি ও ছোট ছোট পাথর দিয়ে মৃতদেহটি ঢেকে দিয়ে হাত ঝেড়ে সামনে এগিয়ে চলল। তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল, গলায় যেন খচ্‌খচ্‌ করে কাঁটা বিঁধছে। আর ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা বোধ হতে লাগল, যেন জলের বদলে সে রক্ত পান করতে পারে এখন।

বোধন বনের ঘন ছায়ার তার শরীরের উষ্ণতা কিছুটা কমে। ছায়া-ঘন গাছ-গাছলিতে পাখি কিচির মিচির করছিল। নিজের পায়ের চাপ বা খরগোশের সরসর আওয়াজ ছাড়া চারদিকে এক গভীর নিস্তব্ধতার অস্পষ্ট পাকদণ্ডী—যে পাকদণ্ডী পথ দেখিয়ে বনের মাঝ দিয়ে চলে গিয়েছে।

এই গভীর নিস্তব্ধতায় রাঘব-এর কান সজাগ হয়ে ওঠে। সে খুব সাবধান এবং সতর্ক হয়ে রইল। আবার কিছুটা আশাও ছিল না তা নয়, যদি কারও সন্ধান পাওয়া যায় তবে এখানেই পাওয়া সম্ভব। চলতে-চলতে কখনও কখনও ওর মনে হচ্ছিল, গাছগুলোর পেছন থেকে অনেকগুলো চোখ তাকে অনুসরণ করছে। যেন কয়েকটা হাত পেছন থেকে ওর পিঠে ছোরা মারার জন্যে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ ভয় পেয়ে ও পেছন ফিরে তাকাল। কিন্তু আশেপাশে কারাও নাম-নিশানা নেই। জঙ্গলে সে একাকী। একটা বড় টিলার ওপর সেলুর ঝোপ। সেই টিলার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেই কে একজন হেঁকে উঠল, 'দাঁড়াও।'

রাঘব রাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

টিলার ওপর একজন মহিলা দাঁড়িয়ে। মহিলাটির গায়ের রঙ কালো, বয়েস অনেক—এবং চেহারা বেশ রুক্ষ! মাথার চুল সাদা, হাতে বন্দুক, দীর্ঘ গড়ন। বৃদ্ধা মহিলাটি তার দিকে বন্দুক তাক করল। রাঘব রাও তাকে চিনতে পারল। চিনতে পেরে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'কানত্তমা!'

মহিলাটি বন্দুক নামিয়ে নিয়ে চোখের ওপর হাতের চেটো রেখে

তাকে চেনার চেষ্টা করতে লাগল।

রাঘব রাও চীৎকার করে বলল, 'আমি রাঘব রাও, মকুবলের সাথী।'

মহিলাটি টিলা থেকে নেমে তার দিকে দৌড়ে আসতে লাগল। আর তার পিছু পিছু তিন-চার জন পুরুষ টিলাটার পিছন থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছিল। রাঘব রাও-এর খুব কাছে এসে কানত্তমা তাকে চিনতে পারল। তার মাথায় মমতায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'বেটা, বড় রোগা হয়ে গেছিস. আমি তো চিনতেই পারিনি।'

রাঘব রাও বলল, 'জেল তো আর মায়ের ঘর নয়।'

কানত্তমা জিজ্ঞেস করল, 'কবে ছাড়া পেলি?'

রাঘব রাও বলল, 'পরশু।'

কানত্তমা জিজ্ঞেস করল, 'মকবুল ভালো আছে তো?' কানত্তমার কণ্ঠে স্নেহ, গভীর মমতা এবং অকৃত্রিম সুর। রাঘব রাও-এর কণ্ঠ কেমন কান্নায় বুজে এল। কানত্তমা ইয়াল্লা রেড্ডির মা,—যার মৃতদেহ সে করিমনগরে দেখে এসেছে। সেই মা রাঘব রাও-এর কুশল জিজ্ঞেস করছে,—মকবুলের কুশল জানার জন্যে উদগ্রীব। কিন্তু সে তার নিজের একমাত্র সন্তান, যে কৃষকদের অধিকার রক্ষা করার জন্যে প্রাণ দিয়েছে, তার সম্পর্কে একটিও কথা বলল না।

রাঘব রাও তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'এই ঘটনা কবে হল আম্মা!'

কানত্তমা রাঘব রাও-এর প্রশ্নের উত্তরটা সরাসরি না দিয়ে ঘুরিয়ে বলল, 'আমাদের গ্রামে এধরনের ঘটনা নতুন কিছু নয়। কৃষকরা যেখানেই জায়গীরদার আর দেশমুখদের খাজনা দিতে অস্বীকার করেছে, সেখানেই এরকম বা এর চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। আমাদের গ্রামের ওপর ওরা রাতের অন্ধকারে হামলা চালায়। হামলা চালিয়ে সারা গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে গিয়েছে। দিনের আলোতে এ কাজ করা অত সহজ ছিল না। রাত ছিল

বলেই গাঁয়ের বহু কৃষক পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে পেরেছে। তারা সবাই এখন আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে।

রাঘব রাও কানত্তমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সেই মুখে কোন ভয় এবং উৎকণ্ঠার কোন চিহ্ন ছিল না। অবিচলিত ভাবে সে কথা বলে যাচ্ছিল। ইয়াল্লা রেড্ডির মা সত্যিসত্যি এক নতুন মাতে রূপান্তরিত হয়েছে। তার নির্ভীকতা এবং ধৈর্যের কয়েকটি গল্পও সে শোনে। কীভাবে সে কৃষক-সভাতেও ইয়াল্লা রেড্ডির বিরুদ্ধে কথা বলেছে, কারণ ইয়াল্লা রেড্ডি ছিল অবস্থাপন্ন কৃষক। সে তাই সঠিক অবস্থা বুঝতে চাইত না। ওর মা-ই ওকে ঠিক রাস্তায় নিয়ে যায়। রাঘব রাও কানত্তমার মুখের দিকে তাকায়। তাকে দেখে তেলেগু ভাষার এক সাধ্বী-রমনীর উপকথা তার মনে পড়ে যায়। সেই উপকথার সাধ্বী রমনী সেবা-যত্নে দাসী, পরামর্শে মন্ত্রী, প্রেমে রম্ভা, খাওয়ানোতে মাতা, যুদ্ধে সৈনিক।

কানত্তমা বলল, 'এখন কী হবে? কৃষকরা তো ভয়ে জঙ্গলে লুকিয়েছে!'

রাঘব রাও বলল, 'মকবুল বলেছিল আর অন্য সাথীদেরও বক্তব্য, এখন খাজনা এবং ট্যাক্স না দেওয়ার অবস্থাটা পেরিয়ে গিয়েছে। এখন কৃষক সভার উচিত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা। যাদের জমি নেই, তারা এরকম অবস্থায় পালিয়ে জঙ্গলে যাবে না তো কী করবে? গ্রামে ওদের কী আছে যে রক্ষা করতে ফিরে আসবে! গ্রামে এদের জমি দাও।'

কানত্তমার পেছনে একজন দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, 'রাঘব রাও, তোমার কথা খুব খাঁটি। জমি জঙ্গলের বাসিন্দাদেরও পাওয়া দরকার। তাহলে গ্রাম এবং জঙ্গলের বন্ধন দৃঢ় হবে।'

সেখানে তখন যে সাথীরা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে একজন দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'অন্ধ্রের জঙ্গলের বাসিন্দারা বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে কম লড়াই করেনি। জংলী গোষ্ঠীর সর্দার অল্লোরি সীতারাম রাজুর লড়াই-এর কাহিনী অন্ধ্রের শিশুরাও জানে। এখনও

লোকে বলে অন্ধ্রের যেখানেই জঙ্গল আছে, সেখানেই অল্লোরি সীতারাম রাজু আজও জীবিত। আর বীর কোয়াদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে-লড়াই-এ এখনও প্রেরণা দিয়ে চলেছে।'

কানত্তমার দুজন সাথী—একজন চামার আর একজন খেত মজুর—দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা, জমি আমাদের হয়ে গেলে দেখি কোন মায়ের ব্যাটা আছে, কিসানদের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নেয়! জমিতো গ্রামের চামার আর খেত মজুররাও নেবে।'

কানত্তমা খানিকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর তার পেছনে দাঁড়ানো একজন কোয়াকে বলল, 'রামলু, জঙ্গলের সমস্ত কিসানদের জানিয়ে দাও, আমরা জঙ্গল থেকে করিমনগর যাব। সেখানে জমি কিসানদের মধ্যে বিলি করা হবে।'

রামলু দৌড়তে দৌড়তে চলে গেল। চামার এবং খেত মজুর দুজনও খবরটা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তার পেছন পেছন ছুটল।

রাঘব রাও বলল, 'আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।'

কানত্তমা টিলার পেছন থেকে মাটির একটা ঘড়া নিয়ে এল। রাঘব রাও ঘড়াতে মুখ লাগিয়ে চক্‌চক্ করে অর্ধেকটা জল খেয়ে ফেলল। জল খাওয়ার পর সে বলল, 'আম্মা, তুমি এত কিছু করতে পারবে তো? নাকি তোমার সাহায্যের জন্যে থেকে যাব?'

কানত্তমা বলল, 'আমি সব করতে পারব। রাঘব, তুই বরং তোর কাজে যা।'

চলতে চলতে রাঘব রাও দেখল কামত্তমা টিলার আড়ালে বসে আছে আর হাঁটুর ওপর বন্দুক রেখে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু এনিয়ে রাঘব রাও আর বেশী কিছু ভাবল না। সে তার আপন পথে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কানত্তমা পেছন থেকে চীৎকার করে তাকে বলল:

'রাঘব রাও শোন!'

রাঘব রাও পিছন ফিরে তাকাল। দেখল, কানত্তমা নিশ্চুপ। উদাস-উদাস চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর কানত্তমা টিলার আড়ালে বসে বসেই অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এখনও কি ওর চোখ ঐভাবেই খোলা রয়েছে?'

রাঘব রাও-এর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। একটি শব্দও তার কণ্ঠ থেকে বের হল না। সে আস্তে তার মাথা কাত করল।

কানত্তমা কিছুক্ষণ শূন্যে তাকিয়ে রইল। তারপর তার ধবধবে সাদা মাথা হাঁটুর ওপর ঝুঁকে পড়ল। চোখ থেকে টপটপ করে জল বন্দুকের নলের ওপর পড়ে নিঃশব্দে বয়ে চলল।

রাঘব রাও-এর মানসপটে ভেসে উঠল আগুনে-পোড়া দেয়াল-গুলি। শাহাবাদী পাথরের উঠোন। উঠোনের ওপর একটা লাশ —যার দেহ একদিকে, মাথা অন্য দিকে; স্থির ছুটো চোখ আর প্রস্তরীভূত সেই চোখ ছুটি একটি প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে যেন তাকিয়ে রয়েছে। রাঘব রাও নিজেকে সংযত করে নিল এবং কানত্তমাকে একলা রেখে নিজের রাস্তায় এগিয়ে চলল। এর মানে এই নয় যে, ওর মধ্যে কোন মানবিক সত্তা নেই—ওর অন্তরে কোন অশ্রু নেই। এর মানে এই নয় যে, সাথী ইয়াল্লা রেড্ডির প্রতি তার কোন মমতা —কোন ভালোবাসা নেই। এসমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও সে তার পথ ধরে এগিয়ে চলল। এগিয়ে চলতে চলতে তার মনে শুধু ছুটি চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল—একটি হচ্ছে মানুষের প্রগতির পথ কতই না ছুর্গম এবং কষ্টকর। আর কত তরতাজা ক্ষত, কত অশ্রুধারা, কত জ্বলে-পুড়ে খাঁক হয়ে-যাওয়া হৃদয়কে দলিত-মথিত করে মানব-প্রগতির পথ এক পা, আধ পা করে এগোয়।

এই হল একটি চিন্তা। আর একটি হল···কানত্তমা যেন এক নতুন মা। বেদনায় ভরপুর তার মমতা আর ভালোবাসা নিশ্চয়ই একদিন নতুন পথ খুঁজে বের করবে। মার একটি শিশু সন্তানের মৃত্যু হলে, তার ক্রোড় এত বিশাল হয় যে, সেখানে হাজার হাজার শিশু-সন্তান

আশ্রয় পাওয়ার জন্যে ছুটে আসে। তাই কানত্তমার জন্যে রাঘব রাও-এর ততটা ভাবনা নেই। কানত্তমার ছু'চোখ বেয়ে যে অশ্রু বয়ে চলেছিল, তা নিঃশব্দে বয়ে চলতে দিয়ে রাঘব রাও তার নিজের পথে এগিয়ে চলল।

অনেক—অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পর আর একটি ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আর এখন—এই মুহূর্তে এই অন্ধ কুঠরিতে সে ভাবনা হাজির হওয়ায় তার মুখ আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। কারণ এই ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠতেই, আর সেই ভাবনার ওপর পা ফেলতেই, রাঘব রাও অজস্র কান্নাকে হাসিতে বদলে নেয়। এই ভাবনা ছিল, কেন সে রানার হবে না? কেন এই অসাধারণ খবর সে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেবে না? আর সঙ্গে সঙ্গে তা কাজে প্রয়োগ করবে না?

বেলমপল্লী গ্রামে সে বিলি-বণ্টনের কাজে অংশ গ্রহণ করল। গৃহহীন, জমি-জিরাতহীন কৃষকদের যে আত্মনির্ভরতা আনন্দ এবং সাফাল্য সে নিজের চোখে তা প্রত্যক্ষ করেছে। আগুনে পুড়ে-যাওয়া ঝুপড়িগুলো আবার বসবাসের যোগ্য হয়ে উঠতে লাগল। গ্রামের পর গ্রাম, যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেজন্যে নর্দমা খোরা হল। জমিতে হাল পড়ল। আর কৃষকদের বুক সাহসে এমন ফুলে ওঠে যে, তা দেখে অত্যাচারীদের হৃদয় ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। গতকালও যারা অত্যাচারী বিচারক এবং মালিক ছিল, লেজগুটিয়ে তারা শহরে আশ্রয় নেয়ার জন্যে ছুটতে লাগল।

বেলমপল্লীর কৃষকরা রাঘব রাও-এর সঙ্গে কৃষকের একটা জাঠা পাঠাল। কৃষকদের সে জাঠা তার সঙ্গে থেকে যেন জমি-বিলি-বন্দোবস্তের কাজে সাহায্য করতে পারে। জমি বিলি করতে করতে রাঘব রাও এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামের দিকে এগুতে লাগল। এ যেন এক উত্তাল তরঙ্গ—যে তরঙ্গকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এ যেন এক বন্যা—যে বন্যা গর্জন করতে করতে উত্তাল বেগে ছুটে আসছিল।

এ যেন সেই অক্ষম—মুলো পদযুগল, যে পদযুগলের পা ফেলে হেঁটে চলার কোন ক্ষমতা ছিল না। আজ সেই পদযুগলই দৈত্যের মতো বিরাট বিরাট পা ফেলছে। যেন এই বন্যার পা মাটিকে স্পর্শ করে আছে, আর তার মাথা ছুয়েছে আকাশকে। আর তার সঙ্গীতের ঝংকার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। যে-কৃষকরা খেতে হাল চালাত, এখন সেই কৃষকরাই তাদের ভাগ্যের ওপর হাল চালাচ্ছে। আজ সারা আকাশ তাদের ফতুয়ার পকেটে। গড়ের খিলানগুলো এক এক করে ভেঙে পড়ছে।

বেলমপল্লী থেকে পাত্তিপাড়ো, পাত্তিপাড়ো থেকে শ্রীপুরম পর্যন্ত জীবনের এক মহান উৎসব চলছিল। আর যে মহান উৎসবে তারা তাদের মাটিতে এর আগে কোনদিন অনুষ্ঠিত হতে দেখেনি। ওর মনে হল, জেলখানার প্রাচীরের প্রতিটি কোণ—প্রতিটি দিশা যেন আজ, এই মুহূর্তে উল্লাস আর আনন্দে ঝলমল করছে। আর সেই উত্তাল তুফান—ঝঞ্ঝার সফেদ ফেনা যেন অন্ধ কুঠরির মধ্যে আছড়ে পড়ে ওকে লহরের মাথায় বসিয়ে শ্রীপুরমের দিকে ছুটে নিয়ে চলেছে।
রাঘব রাও অতীতের দিকে ফিরে তাকাল। ফিরে তাকিয়ে দেখল পাত্তিপাড়ো থেকে শ্রীপুরম পর্যন্ত প্রসাবিত কৃষকদের এক দীর্ঘ—দীর্ঘতর মিছিল। মিছিলের সামনে চলেছে কোয়া স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল। তাদের পিছনে গোয়ালারা। গোয়ালাদের পেছনে বেগারী আর গোলামদের সারি। তারপর পতাকা বাহক শঙ্খবাদক আর ঢুলি। মিছিলের মাঝখানে এক নকশা-কাটা বন্ধ পালকি—আর সেই পালকির দু দিকে লাল রঙের পর্দা বাতসে ফর্‌ফর্ করে উড়ছে। এই বন্ধ পালকির ভেতরে ছিল কাগজ-পত্র। জমি-জমার বন্ধকী দলিল—ইজ্জতের বন্ধকী দস্তাবেজ। এই সমস্ত কাগজপত্র শত-শত বছর ধরে দাসত্ব এবং অত্যাচারের প্রতীক। কৃষকরা জমিদারদের হাত থেকে সেই সমস্ত অত্যাচার আর দাসত্বের প্রতীককে কেড়ে নিয়েছে, কোথাও-কোথাও বা তা কেড়ে নেওয়ার প্রয়োজনও হয়নি।

জমিদাররা নিজেরাই তাদের গড়, তাদের মহল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে।

এই পালকির পেছনে একটা খোলা পালকি রাঘব রাওকে বয়ে নিয়ে চলেছিল। বলতে গেলে ছুটেই চলেছিল। রাঘব রাও হেঁটে যাবে বলে অনুরোধ করে, কিন্তু তারা তা শোনেনি। ওর পালকির পেছনে নাগেশ্বরের পালকি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে পাত্তিপাড়োতে আসে। তাদের পিছনে ছিল কৃষকদের একটা বিরাট মিছিল। এই মিছিলে ছিল ঢোল বাদক, নাচিয়ে এবং ফূর্তিতে গলা-ফাটিয়ে স্লোগান দেওয়ার লোকজন। শিশু বৃদ্ধ মহিলা অন্ধ খোঁড়া নুলো—সবাই নিজের নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। আজ কেউ ঘরে তালা দেয়নি,—কোন চোর এবং অপরাধী ছিল না। আজ সবাই যে জমির মালিক।

ধীরে ধীরে ফরফর করে-ওড়া রেশমের পর্দায়-ঢাকা বন্ধ পালকিটা জমিদারের গড়ের কাছে এসে পৌঁছল। গড়ের অন্দরে গিয়ে বাহকরা পালকিটা নামাল। গ্রামের মেয়েরা আগে ভাগেই গড়ের ভেতর এসে হাজির হয়েছে। আরতি করে পালকিকে বরণ করল, চারদিক থেকে ফুল ছিটোল, পয়সা ছুঁড়ল এবং ভজন গেয়ে স্বাগত জানাল।

এই অপূর্ব দৃশ্য থেকে রাঘব রাও চোখ ফেরাতে পারেনি। বহুবার সে মনে-মনে ভেবেছে, যখন তাদের গ্রামে বিপ্লব হবে তখন অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে। অজস্র রকম কল্পনার রঙ মিশিয়ে সে বিপ্লব সংঘটিত হতে দেখেছে—কখনও সেই বিপ্লবকে মনে হয়েছে এক ঝঞ্ঝা, কখনও মনে হয়েছে দুরন্ত বন্যার বেগে ছুটে-আসা সেনাবাহিনী, আবার কখনও বা মনে হয়েছে লক্ষ লক্ষ সঙ্গীনের মুখে ঢের দিয়ে পড়ে-থাকা অজস্র মৃতদেহ। কিন্তু সে কখনও কল্পনাও করতে পারিনি, তার গ্রামে বিপ্লব আসবে এক লজ্জাবতী কনের মতো লাল পর্দায়-ঢাকা এক বন্ধ পালকিতে চড়ে। কেউ বা তাকে প্রদীপ জ্বালিয়ে বরণ করবে, কেউ বা শাঁখ বাজাবে, মেয়েরা ভজন গেয়ে

বন্দনা করবে আর বাহাদুর কৃষকরা তাদের বন্দুকের ওপর তিলক আঁকবে।

তারপর রাঘব রাও ভাবল, তার এভাবে চিন্তা করাটাই ভুল হয়েছিল। হিন্দুস্তানের বিপ্লব হিন্দুস্তানী ঢঙেই হবে। এই বিপ্লব আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের মেজাজ, আমাদের লোকগীতি এবং তার সুগন্ধে ভরপুর হয়েই আসবে। এতে বিদেশী কোন ছাপ থাকবে না। এর রূপ হবে অনন্য, সম্পূর্ণ নতুন—যে অনন্য যে নতুনত্ব এর আগে কোন দিন আসেনি, কোন দিন শোনা বা দেখা যায়নি। কিন্তু তা সত্বেও তা হবে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় এবং তাকে দেখে আমরা বলতে পারব, 'এই বিপ্লব আমাদের নিজস্ব,—আমাদের একান্ত।' সেই সময় তারা যেন বলতে পারে, 'হ্যাঁ, এ দৃশ্য আমাদের গ্রামের—সত্যিসত্যি আমাদের গ্রামের।'

ঠিক সেই সময় গ্রামের সবচেয়ে বয়ঃবৃদ্ধ নারায়ণ রাঘব রাও-এর হাতে আমিনের জরিপের ফিতেটি দিয়ে বলল, 'বেটা, জমি বিলি করে দাও।'

ফিতেটি হাতে নিয়ে রাঘব রাও বলল, 'এই সময় গ্রামের আমিন থাকলে ভালো হত। কোথায় শ্রীরাম পুত্তুলু?'

রাঘব রাও-এর কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

কে একজন বলল, 'ও তো জমিদারের আমিন, আমাদের গরীব কিসানদের আমিন সে কবে ছিল? সে আমাদের হয়ে কোনদিন জমি জরিপ করেনি। তাই সে জমিদারের সঙ্গেই পালিয়েছে।'

'গ্রামের পুরোহিত শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী কোথায? এই শুভ মুহূর্তে তার আশীর্বাদ দরকার।'

আবার এক হাসির রোল উঠল।

নাগেশ্বর বলল, 'জমিদারের রাজতিলক হলে পুরোহিত নিশ্চয়ই হাজির থাকত। কিন্তু আজ যে কৃষকদের রাজতিলক।'

একসঙ্গে বহু কৃষক অধীর কণ্ঠে বলে উঠল, 'রাঘব রাও দেরী কর

না। জমির ব্যাপারে আমরা কোন পুরোহিত কোন আমিনের অপেক্ষায় বসে থাকব না। কয়েক শতাব্দী ধরে আমরা এই দিনটির জন্যেই অপেক্ষা করে আছি।'

রাঘব রাও জরিপের ফিতেটি হাতে নিয়ে বলল, 'ঢোল-তাশা বাজাও, চল সবাই খেতের দিকে। আজকে শ্রীপুরমের কৃষকদের বিজয় অভিযান শুরু হচ্ছে।'

রাঘব রাও পা বাড়াতেই ঢোলক বেজে উঠল। কৃষকরা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। বৃদ্ধরা খুশির আবেগে কখনও হাসতে লাগল কখনও বা কাঁদতে লাগল। মেয়েরা বিজয় অভিযানের গান গাইতে শুরু করল, আর কৃষকরাও সেই গানের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাল। আর সেই গান গুরু-গুরু গর্জনে রূপান্তরিত হয়ে সমস্ত আকাশকে মুখরিত করে তুলল।

আদরো গণ্ডে, পারি কি কণ্ডা
রুরোগন নট্‌টি, আন্ধ্র পুত্রা
লী জাত থি এদ্দি পরীক্ষা
রাগ ওয়েলা, সাগ বেয়া
সাগ অন্দেকা, জৈন্ন যাত্রা

[ভীরুতা আর দুর্বলতার সঙ্গে অন্ধ্রের সন্তান পরিচিত নয়। আজকে আমাদের জাতির পরীক্ষা। ওঠো, সবাই এস, বিজয়ের মিছিল চলেছে।]

রাঘব রাও নিঃশব্দে তার চোখের কোণে ভরে-ওঠা অশ্রু মুছে নিল। সেই দিনটি—যেদিন কৃষকরা জমি পেল এবং তার আগের যে চারটি দিন শ্রীপুরমে জমি বণ্টনের কাজ চলেছিল, সেই দিনগুলি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্টতম দিন। জমি বণ্টন করার সময় ছোটখাটো ঝগড়া-ঝাটি যে না হয়েছে তা নয়। কেউ এই অংশ, কেউ বা ঐ অংশ চাইছিল। কেউ প্রয়োজনের তুলনায় বেশী জমির প্রত্যাশী ছিল, আবার কেউ তার যে পরিমাণ জমি ছিল তার চেয়ে

অনেক কম করে বলছিল। কিন্তু যারা প্রতিটি জমির সঙ্গে পরিচিত—গ্রামের সেই প্রধান এবং পঞ্চায়েতদের সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে জমি বণ্টনের কাজ শেষ হয়। এই সময় তার বাবা বিরাইয়ার কার্যকলাপের কথা রাঘব রাও-এর মনে পড়ে যায়। রাঘব রাও ঠিক করে তার বাবাকে সবার শেষে জমি দেবে। গ্রামের সমস্ত কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন হয়ে যাওয়ার পর যে জমি বাঁচবে, তার থেকে বিরাইয়াকে দেবে। কারণ সে রাঘব রাও-এর বাবা।

কিন্তু বিরাইয়া ব্যাপারটা একটুও বুঝতে চাইছিল না। তাই জমি বণ্টনের সময় সে বারবার রাঘব রাও-এর সামনে এসে ব্যাকুলতা নিয়ে অবুঝ শিশুর মতো জমির জন্যে জিদ করতে লাগল। আর রাঘব রাও মুচকি হেসে জরিপের ফিতে হাতে এগিয়ে চলল। নিজের সন্তানের এই কঠোর মনোভাব দেখে বিরাইয়া অন্য কৃষকদের কাছে ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ করল। দু-চারজন কৃষক কয়েকবার রাঘব রাওকে বলল, সে যেন সবার আগে জমি নিয়ে নেয়। সে তার বাবাকে গ্রামের সবচেয়ে ভালো জমি দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু হেসে সে সবকিছু নাকচ করে দিল।

অবশেষে বিরাইয়া যখন নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল, সেই সময় সে জমি পেল। সে যতখানি জমি পাবে বলে আশা করেছিল, গ্রামের পঞ্চায়েত তারচেয়ে অনেক বেশি জমি রাঘব রাও-এর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিরাইয়াকে দিল।

বিরাইয়া খুশিতে নাচতে নাচতে দৌড়তে দৌড়তে তার জমিতে গেল। জমির ঝুরঝুরে মাটি দু'হাতে তুলে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'এ জমি আমার। তারপর সে দৌড়তে-দৌড়তে তার ছেলের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

আট

পঞ্চম দিনে জমির শেষ টুকরোটাও বিলি হয়ে গেলে এবং জমির সত্যিকারের মালিকরা জমি পেয়ে যাওয়ার পর রাঘব রাও একদিন ঘুরতে ঘুরতে গ্রামের বাইরে গেল। সেই সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। গাছে গাছে পাখির কলরবে মুখরিত। আর রাস্তার মাঝে এখানে-ওখানে ঘুর্ণি বাতাসে শুকনো পাতা শূন্যে চক্কর খেতে খেতে মচমচ শব্দ তুলে মাটিতে আছাড়ে পড়ছিল। রাঘব রাও চিন্তামগ্ন হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছিল। হাঁটতে-হাঁটতে ও ভোগাবতী নদীর দিকে এগিয়ে চলল।

রাঘব রাও যখন নদীর ধারে পৌঁছল তখন পশ্চিম আকাশে একটা অস্পষ্ট রক্তিম রেখা শুধুমাত্র অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে। একটা কালো পাথরের ওপর সে বসে পড়ল। আর অসংখ্য চিন্তার এক ফাঁকে ধীরে-ধীরে চুন্দরী যেন তার সামনে এসে দাঁড়াল—নীলাভ চোখ, বেনীতে দস্তার দুলন্ত ঝুমুর, লাল পাতলা পাতলা ঠোঁটে দুষ্টুমি -ভরা মুচকি হাসি।

রাঘব রাও বুঝতেই পারল না চুন্দরী কীভাবে তার সামনে এল। কি করে এত বিহ্বলতা, এত তীব্র ছটফটানির মধ্যেও সে তার কল্পনার জগতে এসে দাঁড়াল। আর রাঘব রাও কল্পনায় তাকে যেন জিজ্ঞেস করল,—চুন্দরী, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কোন্ নদীর ধারে, কোন্ তাবুতে বসে কার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলে? আজও কি তোমার স্তন পবিত্র আছে, না কোন প্রার্থীকে তুমি তা উপঢৌকন দিয়েছ?

সহসা রাঘব রাও-এর মনে হল কোন দিন সে চুন্দরীকে ভুলতে পারবে না—চিরকাল তার জন্যে প্রতীক্ষা করবে। কারণ মানুষ যাকে ভালোবাসে তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আর

তাকে না পেলে সারা জীবন তার জন্যে যন্ত্রণা অনুভব করে। এ কোন আশ্চর্য,কোন বিরাট আকাঙ্খা নয়,—যে আকাঙ্খার জন্যে মানুষ তার প্রাণও দিতে পারে। বরং সে তার জন্যে বড় জোর জীবন-ভর একটা বেদনা—একটা যন্ত্রণা অনুভব করে। শুয়ে, জেগে, হাসতে-হাসতে, নাচতে-নাচতে, গাইতে-গাইতে সেই আকাঙ্খিত মানুষটি—সেই জিনিসটি বার বার ঝিলিক দিয়ে ওঠে। না দেখতে চাইলেও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, না ভাবলেও ভাবনায় সটান এসে যায়, না স্মরণ করলেও স্মরণের মণিকোঠায় এসে দাঁড়ায়। আর মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে—জীবনের শেষ প্রান্তে তার রূপের ছটা জ্বলজ্বল করে ওঠে। কারণ তা হচ্ছে মানুষের সুন্দরতম ভাবনার পবিত্র স্মৃতি—যে স্মৃতিকে কোন দিন মুছে দেওয়া যায় না। খানিক আগেও রাঘব রাও-এর মনে হয়েছিল চুন্দরীকে সে চিরদিনের জন্যে তার স্মৃতি থেকে মুছে দিয়েছে—জমির প্রতি যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসা প্রেমের ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছে। কিন্তু ও বুঝতে পারল, কোন একটি প্রেম দিয়ে আর একটি প্রেমকে ধ্বংস করা যায় না। দুটি প্রেম পৃথক পৃথক হয়েও পরস্পরের বন্ধু—সাথী। এ সময় ভোগাবতীর নদীর কিনারে চুন্দরীদের ডেরা না দেখে রাঘব রাও-এর মনের ওপর দিয়ে উদ্বেগ চিন্তা আর উদাসীনতার এক তরঙ্গ বয়ে গেল। রাঘব রাও ঠিক বুঝতে পারল না ও এখন কি করবে। কারণ ন্যায্য জমি বণ্টনের মাধ্যমে জমির সমস্যা মেটানো যায়, কিন্তু প্রেমের সমস্যা তো এভাবে সমাধান হতে পারে না। জমি জরিপ করা সম্ভব, কিন্তু প্রেমকে তো জরিপ করে পরিমাপ করা যায় না।

তার সাথীরা ঠিক করেছিল, যারা কোয়া, যারা যাযাবর, যারা জঙ্গল থেকে জঙ্গলে আর গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় তারা সবচেয়ে বেশী শোষিত শ্রেণী। তাদেরও গ্রামে জমি দেওয়া হবে। হয়তো তার সাথীরা চুন্দরীর মতো মেয়ের চোখের জল যে কত অমূল্য—কত মহান তা জানত। আর একথাও হয়তো তারা জানত জমির প্রতি ভালোবাসা মানুষের অন্যান্য জিনিসের প্রতি যে ভালোবাসা তার

সহকর্মী—তার জন্মদাতা। তাই জমি পেলে চুন্দরীর সমস্ত দেহ পবিত্র হয়ে যাবে।

সে হয়তো চুন্দরীকে আর কোন দিন পাবে না। হয়তো সে আর কোন দিন তার মুখ দেখতে পাবে না। যে দিন সে কান্নায় ভেঙে-পড়া চুন্দরীর পাশ থেকে উঠে চলে এসেছিল, সেই সময় জীবন সম্পর্কে তার কোন গভীর অনুভব বা বোধ ছিল না। সে সময় রাগে সে চুন্দরীর জীবনের অসহায়তা—দুর্বিসহতাকে বুঝতে পারেনি। চুন্দরীদের গোষ্ঠী যাবার, গৃহহীন এবং ভূমিহীন হওয়ার জন্যে সব রকম ভাবেই মালিকের গোলাম ছিল। তাদের অবস্থা ভূমিহীন বেগারীদের চেয়ে, এমন কি পশুর চেয়েও অধম ছিল। এ রকম এক অবস্থায় চুন্দীরকে বেশ্যা বলা বাস্তব সত্যতাকে অস্বীকার করা। সেই সময় সে নিজেও চুন্দরীর থেকে বেশী পবিত্র ছিল না। চুন্দরীর হৃদয়ে ছিল প্রেমের অগ্নিশিখা আর চোখে ছিল এক সুখী জীবনের জন্যে ছলছল অশ্রু।

ওর জন্যে সে আর কোন দিন ঝুপড়ি বানাতে পারবে না। ওর সন্তানকে কোন দিন কোলে তুলে নিতে পারবে না। কোন দিন আর ওর রেশমের মতো নরম, সুন্দর শরীরকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু এ কথা ও বিশ্বাস করে, ওর গ্রামের মানুষের সঙ্গে জমির এক গভীর সৌহার্দ সৃষ্টি হয়েছে। আর এই সৌহার্দ এত সুন্দর যে তার সৌন্দর্যের রঙিন বাহারে জীবনের অন্যান্য সম্পর্কেও সাজিয়ে তোলা যেতে পারে। আর কোন দিন চুন্দরী তার বুকের পবিত্রতার জন্যে কাঁদবে না।

এই সান্ত্বনা-এই বিহ্বলতার আঘাত বুকে নিয়ে ও ভোগাবতী নদীর পাড় থেকে উঠে গ্রামের দিকে ফিরে চলল।

চুন্দরীর ভালোবাসা ছিল রাঘব রাও-এর একান্ত নিজস্ব সমস্যা। কিন্তু জমিদারের গড় হচ্ছে সমস্ত গ্রামের মানুষের সমস্যা। এই গড়টাকে কি করা হবে? জমিদার পালিয়ে যাওয়ার পর গড়টা খালি পড়ে ছিল। এই প্রথম গ্রামের মানুষ জমিদারের ঘরগুলো দেখতে পেল।

এর আগে তারা শুধু গড়ের তোরণ আর তার শান-বাঁধানো চত্তরই দেখেছে, যেখানে হামেশই তাদের বেগারী খাটার জন্যে, ট্যাক্স দেওয়ার জন্যে, জমি ক্রোক করানোর এবং জমিদারের গুণ্ডাদের চাবুক খাওয়ার জন্যে আসতে হত।

কেউ কেউ জমিদারের দেওয়ানখানাও দেখেছে। আর হত-ভাগিনীরা জমিদারের শয়নকক্ষ পর্যন্ত দেখে এসেছে। কিন্তু এর আগে কেউ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে সক্ষম ছিল না, জমিদারের গড়ের পেছনের দিককার বড় ঘরে, তার ঝুলন বারান্দায়, প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এবং মার্বেল পাথরে বাঁধানো ঘরগুলোতে কি কি আছে। প্রথম চার-পাঁচদিন জমি বণ্টনের সময় কারও গড়ের কথা মনেই পড়েনি। কিন্তু যখন বণ্টন ব্যবস্থা শেষ হয়ে গেল, তখন কৃষকরা, তাদের স্ত্রীরা এবং ছেলেপুলেরা দল বেঁধে বেঁধে গড় দেখতে চলল। দরজা একবার খুলে একবার বন্ধ করে তারা দেখতে লাগল। মার্বেল পাথরের মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে হাসতে লাগল। শিশুরা থামগুলোর চারদিকে ছুটোছুটি করে খেলছিল আর তালি বাজিয়ে-বাজিয়ে প্রতিধ্বনি শুনে খুশিতে হাসির রোল তুলছিল। বৃদ্ধরাও গড়ের অন্দরে এমন ভাবে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল, যেন তারা কোন যাদুঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদিও গড়ের মধ্যে কোন অদ্ভুত জিনিস বা অলৌকিক কিছু নেই। গড় অন্ধ্রের প্রতিটি গ্রামেই আছে। আর তার প্রতিটি ইঁট তৈরি হয়েছে কৃষকদের রঞ্জিত রক্তে।

গড়টাকে নিয়ে কি করা হবে তার মীমাংসা মেয়েরাই করল। তারা বলল, অন্দরের জেনানা মহল মহিলা সমিতিকে দেওয়া হোক। কাজ-কর্মের পর তারা সেখানে মিলিত হবে এবং হস্তশিল্পের কাজ করবে। বড় দেওয়ানখানা সম্পর্কে পঞ্চায়েত ঠিক করল, সেখানে পঞ্চায়েত বসবে। রোদে পূজা মণ্ডপের পাথর এত তেতে ওঠে যে সেখানে ঠাণ্ডা মেজাজে বিচার করা সম্ভব নয়।

গড়ের গুদাম ঘরে শস্য মজুত থাকবে। জমিদারের প্রমোদ কক্ষ ছিল বিরাট। রাঘব রাও ভাবল, এখানে শিশুদের জন্যে একটা

পাঠশালা খোলা যেতে পারে। স্কুলের মাস্টারদেরও জমিদার তার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে।

'কিন্তু এখন বাচ্চাদের পড়াবেটা কে?' বৃদ্ধ পুন্নম্মা জিজ্ঞেস করল।

এ এক কঠিন প্রশ্ন। গ্রামের শিক্ষিতরা হচ্ছে পুলিস, প্যাটেল, পাটোওয়ারী, পুরোহিত এবং জমিদারের কর্মচারীরা। আর তারা সবাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। সারা গ্রামে লেখা-পড়া জানা একজনও ও লোক নেই। কারণ জমিদারের বিবেচনায় লেখা-পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। লেখা-পড়া শিখলে নতুন নতুন চিন্তাধারা মগজে আসে—বিদ্রোহের ভাবনা উদয় হয়। কৃষকরা হচ্ছে কলুর বলদ,—তারা নিজেদের মানুষ বলে ভাবতে শিখবে। জমিদারের প্রয়োজন কলুর বলদ—মানুষের কোন প্রয়োজন তাদের নেই।

শেষে রাঘব রাও বলল, 'আমি হায়দ্রাবাদ থেকে লেখাপড়া-জানা লোক আনিয়ে নেব।'

'কীভাবে চলবে?' পুন্নম্মা আবার জিজেস করল।

রাঘব রাও বলল, 'তত দিন পর্যন্ত আমিই পড়াব।'

পুন্নম্মার চোখ আনন্দে চকমক করে উঠল। রাঘব রাও তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এত খুশি হচ্ছ কেন? তোমার তো কোন ছেলেপুলে নেই, যে পড়বে?'

পুন্নম্মা ঘাড় নাড়িয়ে বল, 'না, আমি নিজেই পড়ব।'

রাঘব রাও অন্ধ কুঠরির ঠাণ্ডা শান-বাঁধানো মেঝে থেকে উঠে মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল।

এ পর্যন্ত সব কিছু নির্বিবাদেই হয়েছিল। কিন্তু এরপর যা কিছু ঘটেছিল তা স্মরণ করতেই রাঘব রাওকে খুব ব্যাকুল করে তুলল। ওর গ্রামে যেভাবে জমি বিলি হয়েছিল, সেভাবে অন্যান্য শত-সহস্র গ্রামেও হয়েছিল। দু-চার মাসের মধ্যেই দশ লাখ একর জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। জমিদার আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা বড় বড় শহরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

আর সেখান থেকে রাজাকার, নিজাম শাহীর সৈন্য এবং পুলিসের সাহায্যে গ্রামগুলোর ওপর আক্রমণ করতে লাগল।

শ্রীপুরম গ্রামের ওপরও জগন্নাথ রেড্ডি দু-দুবার আক্রমণ করে। কিন্তু দু-দু'বারই গ্রামের কৃষকরা বীরত্ব এবং সাহসের সঙ্গে তাদের হিংস্র আক্রমণের মোকাবিলা করে—তাদের বাড়ি তাদের জমি আর তাদের মেয়েদের ইজ্জত বাঁচায়। দু'বারই জগন্নাথ রেড্ডিকে ক্ষতি স্বীকার করে হটতে হয়। শ্রীপুরম গ্রামের বহু মানুষ শহীদের মৃত্যু বরণ করে আর রাঘব রাও ভীষণ ভাবে জখম হয়।

তারপর একদিন গ্রামের মানুষ শুনল কংগ্রেস হায়দ্রাবাদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। খবর শুনে বহু লোক খুশি হল। এবার দেশের ওপর জনসাধারণের রাজ কায়েম হয়েছে। এবারে আমাদের কথা শোনা হবে আর জগন্নাথ রেড্ডিকে সরকার নিশ্চয়ই সাজা দেবে। তাই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দীপাবলী উৎসব করবে বলে ঠিক করল। কেউ কেউ এর বিরুদ্ধেও ছিল। রাঘব রাও-এর মনে বারবার সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারছিল। কিন্তু সে কোন কথা বলল না! তাই শ্রীপুরম গ্রাম আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হবে বলে ঠিক হল।

গ্রামের মন্দিরে মণ্ডপে এবং এমন কি গড়ের ওপরে পর্যন্ত প্রদীপ জ্বালানো হল। গড়ের প্রধান তোরণের ওপর হাজার হাজার প্রদীপ ঝলমল করছিল। বহু দূর-দূর থেকে মানুষ এই দীপাবলী দেখার জন্যে এল। এবং নিজেদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে পরস্পরকে অভিবাদন জানাল। মেয়েরা ভজন গাইছিল। কথক চলছিল। গড়ের বাইরে ময়দানে শিশুরা বলংগোডি খেলছিল।

ঠিক এই সময় গ্রামের ওপর একটা প্লেনকে চক্কর খেতে দেখা গেল। দীপাবলীর উৎসব ছেড়ে সবাই প্লেন দেখতে লাগল। প্লেনটি গ্রামের ওপর দু-তিনবার চক্কর কেটে হাজার হাজার লিফলেট ছড়িয়ে দিল। তারপর আকাশে মিলিয়ে গেল। অনেকে খেত থেকে সেই কাগজ কুড়োনোর জন্যে ছুট দিল। গাছের ডালে

এবং ঘরের চালার ওপরও এসে কাগজগুলো পড়ল। বাচ্চারা খেত থেকে কাগজ নিয়ে এল। একজন স্ত্রীলোকের কোলের ওপর উড়ে এসে একটা কাগজ পড়ল। সে কাগজটা নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে রাঘব রাও-এর কাছে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাঘব রাও-এর কাছে শত শত কাগজ জমা হল।

রাঘব রাও ছাপানো কাগজটি পড়তে লাগল। হাজার হাজার কৃষক তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

'রাঘব রাও, বল এতে কি লেখা আছে? এই ছাপানো কাগজে কি বলা হয়েছে?'

অসংখ্য লোক প্রত্যেকেই তাদের হাতের কাগজখানা রাঘব রাও-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'এই ছাপানো কাগজে কি বলা হয়েছে? আমার কাগজটা দেখ, এতে কি লেখা আছে?'

রাঘবও দু-তিনটে কাগজ পড়ে বলল, 'এ কংগ্রেসের লিফলেট। প্রতিটিতে একই বয়ান লেখা আছে।'

'কি লেখা আছে শিগরি-শিগরি বল। আমাদের কংগ্রেস কি বলেছে?'

'কংগ্রেস বলেছে কৃষকরা জমিদারদের যে জমি ছিনিয়ে নিয়েছে, সেই জমি যেন তাদের ফেরত দিয়ে দেয়। কারণ জমিদাররাও কৃষকদের ভাই। ভাই-এর হক ভাই-এর ছিনিয়ে নেওয়া উচিত নয়। সেজন্যে কৃষকদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন জমি জমিদারদের কাছে ফেরত দিয়ে দেয়।'

রাঘব রাও কাগজ পড়ে কৃষকদের মুখগুলো দেখতে লাগল। কৃষকদের ভীড়ের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা—একটা মৌনতা অনেকক্ষণ ছেয়ে রইল। কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

অবশেষে একজন কৃষক বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'জমি তো তারই, যে জমিতে লাঙ্গল চালায়, কাজ করে, পরিশ্রম করে। যারা অন্যের মেহনতের ওপর—অন্যের কামাই-এর ওপর মহল তৈরি করে জমির মালিক সে কিভাবে হতে পারে! আর অন্ধ্রের কৃষকদের কংগ্রেস

বলছে জমি জমিদারদের ফেরত দাও। অথচ যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের জমি জবর দখল করে এসেছে তাদের কিছু বলছে না।'

রাঘব রাও বলল, 'জমিদার তো তোমাদের ভাই। একথা এই কাগজে লেখা আছে।'

'ভাই আমাদের নয়, হলে কংগ্রেসের ভাই হতে পারে—ওরা আমাদের শত্রু।' একজন চীৎকার করে বলে উঠল।

বৃদ্ধা পুন্নমা রাগে বলে উঠল, 'যে যাই বলুক, উড়োজাহাজ কেন স্বয়ং ভগবান এসে বললেও আমরা আমাদের জমি জমিদারকে ফেরত দেব না।'

পুন্নমা কথাগুলো বলে রাগে গড়ের দিকে ছুটে গেল এবং একটি জ্বলন্ত প্রদীপকে তুলে মাটিতে ছুঁড়ে দিল। তারপর সমস্ত প্রদীপগুলো ফুঁ দিয়ে দিয়ে নেভাতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সারা গড় অন্ধকারে ছেয়ে গেল। সমস্ত গ্রামেও প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হল। কৃষকরা চিন্তান্বিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চায়ি করতে লাগল।

তারপর একদিন জগন্নাথ রেড্ডি আর প্রতাপ রেড্ডি পুলিস এবং ফৌজ নিয়ে শ্রীপুরমে এল। এবং তারা গ্রামের ওপর অধিকার কায়েম করল। রাঘব রাও তখন স্কুলে পড়াচ্ছিল, সেই সময় তাকে গ্রেফতার করা হল।

রাঘব রাও-এর ওপর রাজাকারদের হত্যার অভিযোগ আনা হল। তারপর মোকদ্দমা চলল। তাকে ফাঁসীর দণ্ড দেওয়া হল। আগামী কাল ভোর সাতটায়...

রাঘব রাও নিজের মনকে জিজ্ঞেস করে। সত্যিই কি সে হত্যাকারী? হত্যার যে আকৃতি বা রূপ সেই আকৃতি নানা রকমের হতে পারে। হত্যাকারী যাকে মনে রাখে, যাকে ঘৃণা করে, যার প্রতি প্রতিশোধ

স্পৃহা থাকে বা যে বিভিন্ন ধরনের ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়—তা ঘৃণারই হোক বা ভালোবাসারই হোক, তাকেই সে হত্যা করে। রাত্রির অন্ধকারে রাজাকাররা পুলিস আর সৈন্যের সাহায্যে গ্রামের ওপর আক্রমণ করে। গ্রামকে রক্ষা করার সময় তার সামনে কোন রূপ বা আকৃতি ছিল না। ছিল শুধু অত্যাচারীর এক অন্ধ শক্তি। এর আগে সে গ্রামকে গ্রাম জ্বলতে এবং আগুনের লেলিহান শিখায় খেতের ফসল পুড়ে খাক হয়ে যেতে দেখেছে। দেখেছে ইয়াল্লা রেড্ডির নিথর চোখ। এই সব কিছু দেখেই সে দৃঢ় সংকল্প নেয়। সে কোন ব্যক্তি বিশেষের রূপ বা আকৃতি দেখেনি । সে শুধু তার গ্রামের ওপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের কালো ছায়া দেখেছে । আর সে সামনে এগিয়ে গিয়ে সেই অত্যাচারের বুক লক্ষ করে বর্শা ছুঁড়ে দিয়েছে । অত্যাচারের বিরোধিতা করা কি হিংসা—নিজের প্রাণ রক্ষা করা, নিজের মায়ের ইজ্জত বাঁচানো, নিজের খেতের সোনালী ফসলের মঞ্জরি রক্ষা করা কি হিংসা? আর হৃদয়ের স্পন্দনও কি হিংসায় স্পন্দিত ?

রাঘব রাও শেষ বারের মতো নিজের মনকে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কোন অপরাধের মুখ তার সামনে ভেসে উঠল না, যে মুখ দেখে তার হৃদয় লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। আর এ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সে তার জীবন-গ্রন্থের পাতাগুলি বন্ধ করে দিল। এবং সে তখন বিনা দ্বিধায় —আনন্দের সঙ্গে মৃত্যুকে দেখার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল।

নয়

অন্ধ কুঠরির দরজা ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগল। রাঘব রাও গরাদের ওপারে তার বাবার মুখ দেখতে পেল। আর ঠিক তার পেছনেই বুড়ো ওয়ার্ডার দাঁড়িয়ে। তার টানা টানা কালো চোখ দুটি জলে ছলছল করছিল।

বিরাইয়া ধীরে ধীরে পা ফেলে তার ছেলের দিকে এগিয়ে আসে। তারপর কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়।

রাঘব রাও খুব, খুব ধীরে ধীরে বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা গলায় বলল, 'বাবা বস।'

বিরাইয়া এবং রাঘব রাও অন্ধ কুঠরির মেঝের ওপর বসে পড়ে। বিরাইয়ার ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপতে থাকে, হাতের মুঠি শক্ত হয়ে ওঠে। আর মাথাটা এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে মৃদু মৃদু দুলে চলে। যেন অনেক, অনেক কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু কোন কথাই সে বলতে পারছিল না। ওর এই অবস্থা দেখে রাঘব রাও-এর হৃদয় কান্নার আবেগে ভরে উঠল। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করল :

'গ্রামের অবস্থা কী রকম ?'

'গাঁয়ে আর জনমনিষ্যি নেই। যত জোয়ান ছিল, প্রায় সবাই গ্রেফতার হয়ে গিয়েছে, আর যারা ধরা পড়েনি তারা জঙ্গলে আত্ম-গোপন করে আছে। তাদের ধরার জন্যে পুলিস দিন রাত্রি অতর্কিতে আক্রমণ চালাচ্ছে। কখনও কখনও গভীর রাতে জঙ্গল থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসে। আওয়াজ শুনে বুড়ি পুন্নম্মা বলে, 'ঐই আর একজন গেল। তারপর হো হো করে হাসতে থাকে।'

রাঘব রাও জিজ্ঞেস করল, 'বুড়ি মা পুন্নম্মা ?'

'হাঁ, পুন্নম্মা পাগল হয়ে গিয়েছে।'

রাঘব রাও বেশ খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারে না। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'আর জগন্নাথ রেড্ডি।'

'জমিদার তার গড়ের বাইরে এক পাও বেরোয় না। গড়ের ভেতর তো পুলিস আর সেনাবাহিনীর এক বিরাট পাহারা বসেছে। তাছাড়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে কড়া পুলিসী পাহারা। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাওয়ার সময় এই সব চৌকিগুলিতে কৃষকদের জোর তালাসী চলছে।'

আবার কিছুক্ষণের জন্যে নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

বিরাইয়ার ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে থাকে। কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে বলল, 'গাঁয়ের মানুষজন বলছে, তোমার আপীল নামঞ্জুর হয়ে গিয়েছে!'

রাঘব রাও বলল, 'হাঁ।'

'রঙডু ধোপা বলছিল, 'জগন্নাথ রেড্ডি বলছে, রাঘব রাও যদি ক্ষমা প্রার্থনা করত, তবে আর সাজা হত না।'

'কি জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা চাইব?' রাঘব রাও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

অত্যন্ত নরম স্বরে বিরাইয়া বলল, 'আমি কিছু বলিনি, রঙডু ধোপাই বলছিল।'

রাঘব রাও তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি ইচ্ছে বাবা?'

বিরাইয়া থেমে থেমে বলতে লাগল, 'কখনও কখনও মনে হয়, তুই যা কিছু করেছিস, ঠিকই করেছিস। আবার কখনও কখনও ভাবি, তুই আমার একমাত্র ছেলে…।' বলতে বলতে বিরাইয়া মাথা নীচু করে নেয়।

রাঘব রাও বাবার কাঁধে হাত রাখে, 'বাবা, তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে গড়কে ঘৃণা করতে। আজ কি তুমি সেই ঘৃণা আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে এসেছ?'

বিরাইয়া বিনাদ্বিধায় বলল, 'না। কিন্তু বাবা, আমি তো

অশিক্ষিত—মুর্খ কিসান। মাঝে মাঝে ভেবেও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, আমার একমাত্র ছেলেকে আমার কাছ থেকে কেন ছিনিয়ে নেওয়া হল? যখন জঙ্গল থেকে মাঝে-মধ্যে গুলির আওয়াজ ভেসে আসে, তখন রাতকে আরও ঘন আরও কালো মনে হয়।'

রাঘব রাও তার বাবার কাঁধ থেকে হাত নামায় না, বরং আরও আবেগে চেপে ধরে। তারপর ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দের অর্থ ভেঙে ভেঙে ওর বাবাকে বলতে থাকে, 'বাবা, তোমার সেই মেলার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। আমি রামাইয়া চেট্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রেশমের থানে হাত দিয়েছিলাম বলে সে আমাকে কি গালি-গালাজই না করেছিল। আর তুমি এক ঝটকায় রেশমের থান থেকে আমর হাত সরিয়ে দিয়েছিলে। হয়তো সেই মুহূর্তে তুমি তোমার ছেলের মনের আকুতি বুঝতে পেরেছিলে। বুঝতে পেরেছিলে তোমার ছেলেও জগনাথ রেড্ডির ছেলে প্রতাপ রেড্ডির মতো রেশমের জামা পরতে চায়। কিন্তু তুমি ভালোভাবে জানতে, রেশম তো গোলামদের জন্যে নয়। একদিকে তাবৎ খিদে, অন্যদিকে তাবৎ ফসল। একদিকে যত অপমান আর লাঞ্ছনা, আর অন্যদিকে সমস্ত মান ইজ্জৎ।··· বাবা, তোমার ছেলে রেশমের থান স্পর্শ করে তেমন কোন অন্যায় করেনি। সে শুধু রেশমের থানকে স্পর্শ করে সেই যুগকেই একান্ত কাছে আনতে চেয়েছিল, যে যুগে মানুষ রেশমের গুটির জন্যে, গমের মঞ্জরির জন্যে আর খেতের রমণীয়তার জন্যে আর আকুল কান্নায় ভেঙে পড়বে না। সে-যুগে মানুষের জন্যে মজুত থাকবে অপার রূপ-লাবন্য। এই দূরদৃষ্টির অপরাধে তোমার ছেলেকে আগামীকাল ভোর সাতটায় ফাঁসী দেওয়া হবে। হাঁ, শুধু, শুধু এটুকু ছাড়া তোমার ছেলে আর কোন অপরাধ—কোন অন্যায় করেনি।'

বিরাইয়া নীরবে কাঁদতে লাগল।

রাঘব রাও আবার বলল, 'বাবা, তুমিই যদি এমন ভাবে কাঁদো, তবে দুনিয়ার মানুষ কী বলবে! আর গ্রামের লোকেরাই বা কী বলবে! জমিদারের গড়, তোমার এই কান্না দেখে কী না খুশি হবে!

বিরাইয়া চোখের জল মুছে ফেলল। অনেকক্ষণ ধরে রাঘব রাও বিরাইয়াকে বোঝাতে লাগল। এত স্নেহ এত মমতা আর আন্তরিকতা নিয়ে এর আগে সে আর কোন দিন তার বাবার সঙ্গে কথা বলেনি। এত দিন ধরে সে যেমনটি আছে, যেমন ভাবে ভেবেছে, যা করতে চেয়েছে, বা যা হতে চেয়েছে—সে সব কিছু আজ যেন সে তার বাবার হৃদয়ে উজাড় করে ঢেলে দিতে চাইছে। আজ সে তার সমস্ত কথা—সমস্ত ইচ্ছা বাবাকে বলে বিদায় নিতে চাইছিল। রেশমের জামার কথাটাই তার বাবা সবচেয়ে গভীর ভাবে অনুভব করতে পারে। তাই সে তাকে হায়দ্রাবাদের গল্প বলল। কেন রেশমের জামার জন্যে তার মন এত ছটফট করে উঠেছিল। আর এই রেশমের জামা পরার জন্যে সে কত কষ্ট করেই না টাকা জমিয়ে ছিল। তারপর কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল। সে আর তার সেই আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেনি। হয়তো এ খুবই সাধারণ—খুবই তুচ্ছ কথা। কিন্তু এই সাধারণ আর তুচ্ছ কথা, রেশমের এই জামা, ফসলের এই মঞ্জরি, প্রতিষ্ঠার এই এক টুকরো হাসি, সৌন্দর্যের এই আলোক ছটার জন্যেই গোলামদের দুনিয়ায় অভাব আর দারিদ্রের যে মরুভূমি, সেই মরুভূমি হু হু করে প্রসারিত হয়েছে। আর কতদিন এই দুনিয়াতে বন্ধ্যাত্ব আর স্তব্ধতা বিরাজ করে? এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে ওপর থেকে কেউ থেকে নেমে আসবে না। গোলামদের নিজেদেরই এ কাজ করতে হবে। তা না হলে হাজার হাজার বছরের মতো আজও রেশম ঐদিকেই থাকবে, আর এদিকে থাকবে শুধু নাঙ্গা—বেআবরু দুনিয়া।

অনেক, অনেকক্ষণ ধরে রাঘব রাও তার বাবাকে বোঝাতে লাগল। ওর বাবা গভীর মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনে যেতে লাগল। বাবা এবং ছেলে পরস্পরে এত ঘনিষ্ট হয়ে বসে তন্ময় হয়ে কথা বলে যেন তারা অন্ধ কুঠরিতে বসে কথা বলছে না,—নিজেদের গ্রামের মণ্ডপে বসে আছে। হঠাৎ কে যেন অন্ধ কুঠরির দরজায় ধাক্কা দিল। আর

সঙ্গে সঙ্গে রাঘব রাও এবং বিরাইয়া দুজনেই চমকে ওঠে।

দরজায় বৃদ্ধ ওয়ার্ডার দাঁড়িয়ে ছিল।

মাফ চেয়ে সে বলল, 'এখন আমার ডিউটি শেষ হয়ে যাবে। তোমাকে এখন চলে যেতে হবে। নতুন ওয়ার্ডার দেখে ফেললে মুশকিল হয়ে যাবে। ও খুব কড়া লোক।'

বিরাইয়া উঠে দাঁড়াল। রাঘব রাও-এর দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে সে বলল, 'গ্রামে ফিরছি। আবার কালকে আসব।'

'তুমি গ্রামে কি জন্যে যাচ্ছ? এই শহরেই না হয় জেলের বাইরে কোথাও শুয়ে থাক।'

বিরাইয়া বলল, 'না, আমি গ্রামে যাব। ভোরে চলে আসব। আজ সারা রাতটা যদি চলতে পারি তবে ভালো, তা হলে···'বিরাইয়া কথা শেষ না করেই সেখান থেকে চলে গেল।

দশ

বিরাইয়া যখন গ্রামে ফেরে ততক্ষণে সবাই শুয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র পুন্নম্মার কুঁড়ে ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল, ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ধীরে ধীরে বিরাইয়া পুন্নম্মার ঘরে ঢুকল। এত রাত্রি পর্যন্ত পুন্নম্মাকে জেগে আছে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। তার চোখে কেমন একটা ব্যাকুলতা আর ভয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে আছে। বিরাইয়াকে দেখে পুন্নম্মা খাটিয়া থেকে তাড়াতাড়ি তার কাছে নেমে এল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলতে লাগল:

'আমার ছেলে কেমন আছে?' চারদিকে তাকিয়ে পুন্নম্মা জিজ্ঞেস করল।

'ভালো আছে, তোমাকে প্রণাম জানিয়েছে।'

'বেঁচে থাকুক, আমার প্রিয় ছেলে যুগযুগ ধরে বেঁচে থাকুক।'

পুন্নম্মা গড়গড় করে বলে যেতে লাগল। বলতে বলতে হঠাৎই সে চুপ করে যায়। তারপর অকারণে হো হো করে হেসে উঠল।

বিরাইয়া অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল।

হাসতে হাসতে পুন্নম্মা থেমে গিয়ে বিরাইয়ার দিকে গভীর ভাবে তাকায়। তাকিয়ে বলল, 'বিরাইয়া, আমার মাথার কোন দোষ হয়নি—আমি পাগলী নই। হাঁ, কখনও কখনও আমার মন এমন সচকিত হয়ে ওঠে—এমন ঘাবড়ে যায় যে, তখন আমি আর না হেসে থাকতে পারি না। না হাসলে আমি মরে যাব যে।'

পুন্নম্মা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিরাইয়া তোমাকে খুব ভালো-ভাবেই জানি। নিশ্চয়ই তোমার মনের মধ্যে এমন কোন গোপন কথা বা ইচ্ছে আছে, যা তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। সেই কথাটি কি বল?'

বিরাইয়া বলল, 'না মা, কোন কথা বা ইচ্ছে আমার নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে। আমাকে বল, তা না হলে আমি গলা ফাটিয়ে হাসব।' বিরাইয়া বলল, 'মা, আমার মনে হল, আমার ছেলে রেশমের জামা পবতে চায়।'

'রেশমের জামা! 'পুন্নম্মা হো হো করে হেসে উঠল। আবার বলল, 'রেশমের জামা···কী বলছিস! রাঘব রাও কি নিজের থেকে বলেছে?'

'না মা, সে নিজের থেকে কিছু বলেনি। আমিই ভাবছিলাম, যদি তাকে এসময়ে রেশমের জামা পরাতে পারতাম, তবে মৃত্যুর সময় সে কী না খুশি হত।'

পুন্নম্মা জোরে জোরে সমানে হাসতে লাগল। 'রেশমের জামা। হা হা হা! রেশমের জামা! তুই একটা মজার কথা বললি বটে। হা হা হা! বিরাইয়া তুই চিরটা কাল আহাম্মকই রয়ে গেলি। রেশমের জামা! হা হা হা! এই গ্রামে কার কাছে রেশমের জামা আছে? বিরাইয়া, তুই একেবারে মুখ্যু।'

বলতে বলতে পুন্নম্মা হো হো করে হেসেই চলল।

বিরাইয়া বিনীত ভাবে তাকে বলল, 'পুন্নম্মা, তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। তুমি একজন বাবার মনের কথা বুঝবে কেমন করে। সেদিনের কথা আমার আজও মনে আছে, যখন আমি ওকে তালপাতার ছাতা কিনে দিয়েছিলাম, তখন রাঘব রাও কি খুশিতেই না আমার দিকে তাকিয়েছিল। ওর প্রতিটি খেলনার কথা আজও আমার মনে আছে। তুমি তো জানোই, গোলামরা তাদের ছেলেপিলেদের ঢের ঢের খেলনা দিতে পারে না। গোলামদের ছেলে-মেয়েরা জীবনে খুব অল্প খেলনাই দেখেছে। নানা রকম খেলনা দিয়ে খেলার আকাঙ্খা তাদের মনের মধ্যে রয়ে যায়। আজ যখন আমার বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে রাঘব রেশমের জামার কথা বলছিল, তখন আমি তার চোখে ছেলেবেলার সেই চমক দেখেছিলাম। যেন সেই আকাঙ্খা আবদার তার বাবার মনকে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরছে। পুন্নম্মা, তুমি তো মা, তোমার মধ্যে কি এই অনুভূতি নেই?'

বিরাইয়া জিজ্ঞেস করল, 'গ্রামের কার কাছে রেশমের জামা পাওয়া যেতে পারে?'

পুন্নম্মা আবার হো হো করে হেসে উঠল। পুন্নম্মার অট্টহাসিতে আস-পাশের কয়েকজন কৃষক তাদের কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বিরাইয়াকে দেখে তাদের সাহস ফিরে এল। তারা জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'কি ব্যাপার, পাগলী এত হাসছে কেন?'

পুন্নম্মা বলল, 'পাগল আমি, না যে বলছে আমার ছেলের জন্যে রেশমের জামা চাই, সে?'

বিরাইয়া কৃষকদের কাছে সমস্ত কথা খুলে বলল।

একজন কৃষক ভয় পেয়ে বলল, 'বিরাইয়া, আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখন জামা কোথা থেকে পাওয়া যাবে। জানি না কার কাছে জামা আছে! ভোরে রাঘব রাও-এর ফাঁসি হবে আর তুমি এখন রেশমের জামা খুঁজছ? রাঘব রাও যদি শোনে তার বাবা তার মৃত্যুর সময় এমন ঝঞ্ঝাট করছে তবে সে

রাগ করবে।'

আর একজন কৃষক বলল, 'সামনের মাসে গৌরম্মার বিয়ে। ওর বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করা যাক, বিয়ের জন্যে সে কোন রেশমের কাপড় কিনেছে কিনা। তাহলে বিরাইয়ার সাধ পূরণ হয়ে যাবে।

আর একজন কৃষক বলল, 'তুমি একটা নিরেট মূর্খ। গৌরম্মার বাবার কাছে রেশমের কাপড় কেনার মতো পয়সা কোথায় আছে! পাগল বনে যেও না।

বিরাইয়া কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'জিজ্ঞেস করলে দোষের কি?' কয়েকজন কৃষক তার সঙ্গে গৌরম্মার বাড়িতে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল।

একজন বৃদ্ধ কৃষক বলল, 'যদি পুলিস এসে জিজ্ঞেস করে এত রাত্রে তোমরা কি ফুসুর ফুসুর করছ, তখন কি হবে?'

আর একজন কৃষক সঙ্গে সঙ্গে বলল 'তখন দেখা যাবে, এখন গৌরম্মার বাড়িতে চল।'

যে সব পাড়ার মধ্যে দিয়ে তারা গেল, সেখানকার কৃষকরা জেগে উঠল। এবং তারাও তাদের সঙ্গ নিল। রেশমের জামার কথা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সবাই গৌরম্মার বাড়িতে পৌঁছনোর আগেই সেখানে খবর পৌঁছে গিয়েছিল। হাত জোড় করে সে বলল, গৌরম্মার বিয়ের জন্যে যা কাপড়-চোপড় কেনা হয়েছে সবই খাটের ওপর রেখে দিয়েছি। এর মধ্যে একটিও রেশমের কাপড় নেই। ইচ্ছে করলে আমার ঘর তল্লাস করে দেখতে পার। রাঘব রাও-এর জন্যে রেশমের কাপড় কেন, আমার জান পর্যন্ত আমি দিয়ে দিতে পারি।'

গৌরম্মার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে লোকে চারদিকে খবরা-খবর নিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিটি বাড়িতেই কাপড়ের খোঁজ শুরু হল। সমস্ত গ্রামই যে-কোন জায়গা থেকে রেশমের জামা সংগ্রহ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। বৃদ্ধরাই সব চেয়ে বেশী

খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। যুবকরা যদিও সাথে সাথে ছিল, কিন্তু ব্যাপারটাকে তারা বিরাইয়ার একটা পাগলামো ছাড়া বেশী কিছু মনে করল না। ঘরে ঘরে বন্ধ দরজার আড়ালে পরামর্শ চলতে লাগল। ইতিমধ্যে রামলু ধোপা ছুটতে ছুটতে বিরাইয়ার কাছে এল। তার সঙ্গে ময়লা কাপড়ের একটা বোচকা। বোচকাটা সে বিরাইয়ার সামনে খুলে বলল, 'এর মধ্যে রেশমের দুটো জামা আছে। একটা জগন্নাথ রেড্ডির আর একটা প্রতাপ রেড্ডির।'

বিরাইয়া ঘৃণার সঙ্গে বলল, 'আমার ছেলে জমিদারের গায়ে-দেওয়া জামা পরবে? রামলু তুমি কেমন ধারা কথা বলছ?'

রামলু চিন্তান্বিত হয়ে বলল, 'তবে গ্রামে রেশমের জামা আর কোথায় পাওয়া যাবে!'

বিরাইয়া কোন জবাব দিল না। অনেক যুবকই চলে গিয়েছিল।

হঠাৎ বিরাইয়ার মনে একটা স্মৃতি ঝিলিক দিয়ে উঠল। সে ছুটতে ছুটতে তার কুঁড়ে ঘরে গেল। তারপর কাঠের সিন্দুক খুলে পুরনো সমস্ত কাপড় বের করল। সবচেয়ে তলায় তার স্ত্রীর বিয়ের সময় যৌতুকে পাওয়া কাপড়গুলো ছিল। সমস্ত কাপড়ই ছিঁড়ে-ফেঁটে গিয়েছিল, শুধু রেশমের একটা ওড়না কোন রকমে বেঁচে গিয়েছে। এই ওড়নাটাক রাঘব রাও-এর মা তার পুত্রবধুর জন্যে রেখে গিয়েছে। কখনও কখনও সে খুব গর্বের সঙ্গে এই ওড়নাটা দেখিয়ে বিরাইয়াকে বলত, একটিও গোলামের বউ-এর কাছে এরকম ওড়না আছে? এই ওড়না আমার ছেলের বউকে দেব।'

বিরাইয়া খুব সযত্নে সিন্দুকের সমস্ত কাপড়ের নীচ থেকে কুঁচ-কানো সেই ওড়নাটি বের করল। লাল রঙের সুন্দর একটা ওড়না। পুরনো আমলের রেশম বলে এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। প্রদীপের আলোয় ওড়নাখানি সবার চোখকে ধাঁধিয়ে দিল। ছেলে ছোকরারা আনন্দে চীৎকার করে উঠল। যেন কোন এক লড়াই-এ তাদের বিজয় হয়েছে।

বিরাইয়া জিজ্ঞেস করল, 'এই ওড়না দিয়ে জামা হবে?'

একজন কৃষক বলল, 'কেন হবে না? সোমপ্পা দর্জিকে এখনই ডেকে আন। আর বেশী সময় নেই।'

একজন সোমপ্পাকে ডাকতে চলে গেল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সোমপ্পাকে সঙ্গে করে সে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল।

সোমপ্পা ওড়না দেখে বলল, 'কাপড়টা ছোট আছে, এতে জামা হবে না। ফতুয়া হতে পারে।'

উৎসাহে যুবকরা চীৎকার করে বলল, 'তবে ফতুয়াই বানাও। কিন্তু তাড়াতাড়ি কর।'

সোমপ্পা বলল, 'মেশিনটা তো ঘরে ছেড়ে এসেছি।'

মেশিন আনার জন্যে একজন কৃষক তার বাড়িতে গেল। আর সোমপ্পা ওড়নার ভাঁজ খুলে খুলে দেখতে লাগল। দেখল দু'জায়গায় পোকায় কেটে ফুটো করে দিয়েছে।

বিরাইয়া চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন তবে কি হবে?'

সোমপ্পা হেসে বলল, 'ভাবনার কিছু নেই। আমি এমনভাবে কাটব যে ফতুয়াতে কোন ফুটো থাকবে না। রাঘব রাও-এর ফতুয়াতে কোন ছিদ্র থাকতে পারে না।'

এরই মধ্যে মেশিন এসে গেল। সোমপ্পা খুব সাবধানে রেশমের ওড়নাটা কেটে মেশিনে ফেলে সেলাই করতে লাগল।

প্রায় অর্ধেক গ্রাম তার মেশিন চালানো দেখতে লাগল। এমন অপূর্ব জামা আজ পর্যন্ত তারা সেলাই করতে দেখেনি। মনে হচ্ছিল যেন, রেশমের প্রতিটি সুতোর সাথে সাথে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস সেলাই করা হচ্ছে। যেন তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা রেশমের কাপড়ের ভাঁজের বাইরে উঁকি-ঝুঁকি মারার চেষ্টা করছে। মেশিন চালাতে চালাতে দু-একবার সোমপ্পা সামান্য একটু রেশম ছিঁড়ে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠ থেকে বেদনার স্বর বেরিয়ে এল। যেন তাদের হৃদয় কেউ টুকরো টুকরো করে ফেলছে।

তাই সোমপ্পা আরও সাবধানতার সঙ্গে মেশিন চালাতে লাগল।

একজন মহিলা বলল, 'সোমপ্পা, তাড়াতাড়ি কর। তোমার জামা

তৈরি হয়ে গেলে আমরা এর ওপর ফুল তুলব।'

যুবকরা আশ্চর্য হয়ে মহিলাটির মুখের দিকে চাইল।

মহিলাটি বলল, 'মহিলা সমিতিও রাঘব রাও-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে।'

এরপরে সেই জামা বা ফতুয়াটি আর শুধুমাত্র বিরাইয়ার একান্ত সন্তানের রইল না, যেন তা সারা গ্রামের সন্তানের হয়ে গেল। পাঁচজন মহিলা গান গাইতে গাইতে তার ওপর সুতো দিয়ে ফুল পাতার কাজ করতে লাগল। আর বুকের ওপর কাস্তে হাতুড়ি এবং গমের শীষ আঁকল। মহিলারা জামার ওপর তিলক লাগাল। কয়েকজন মহিলা আবার এরই মধ্যে ফুলের মালা তৈরি করেছে। আর জামাটাকে সেই ফুলের মালার ওপর রাখল।

এর মধ্যে কারও খেয়াল হল, সব কিছুই তো হল কিন্তু জামাটা ইস্ত্রি করা বাকী রয়ে গিয়েছে। সোমপ্পার কাছে কোন ইস্ত্রি ছিল না। ধোপার কাছে যে ইস্ত্রিটি ছিল তা ঠিক করার জন্যে সে শহরে দিয়ে এসেছে। জমিদারের দর্জির কাছে একটা ইস্ত্রি আছে। তার বাড়ি ঠিক গড়ের পিছন দিকে। কিন্তু সেখানে কে যাবে? কারণ খুব কাছেই পুলিসের পাহারা আছে। যদি কোন পায়ের শব্দ পায়…হয়তো ইতিমধ্যে তারা পায়ের শব্দ শুনেও থাকবে…এবং তারা হয়তো কোন আক্রমণের প্রত্যাশাও করছে।

দুজন কৃষক বলল তারা গড়ের পেছন দিকে গিয়ে দর্জির কাছ থেকে ইস্ত্রি চেয়ে আনবে। কৃষক দুজন চলে গেলে অগণ্ডু বেগারী বলল, 'জঙ্গলে আর প্রতিটি গ্রামে খবর দাও। আমরা রেশমের জামা নিয়ে জেলখানায় যাব।'

অল্পক্ষণের মধ্যে সারা গ্রামের মানুষ মণ্ডপে এসে জমায়েত হল। মশাল জ্বলছে, শ্লোগান চলছে। এখন আর কারও জমিদার এবং তার খিদমদগারদের ভয় নেই। সেই দুজন কৃষক ইস্ত্রি নিয়ে ফিরে এল। তাদের একজনের হাঁটু গুলিতে জখম হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় সবার উৎসাহ এবং উদ্দীপনার উত্তপ্ততা এমন স্বরগ্রামে উঠেছিল যে

গগনভেদী স্লোগান দিতে লাগল। স্লোগানের ধ্বনি ঢেউ খেলে খেলে অন্য গ্রামকেও মুখরিত করে তুলল। সেখান থেকে স্লোগানের জবাবে স্লোগানে ফিরে আসতে লাগল। ইস্ত্রি করে জামা টাকে ফুলের মালা দিয়ে আবার সজ্জিত করা হল। ইতিমধ্যে পত্তিপাড়ি গ্রাম থেকে কথক ঢুলি এবং কৃষকদের দলের পর দল আসতে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই কৃষকদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা বেড়ে চলল।

সেই রাতকে কেউ ভুলতে পারবে না। সেই রাত্রে পাঁচ হাজার কৃষক মশাল হাতে নিয়ে জমিদারের গড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেই সময়ে গড়ে কেউ ছিল না। জমিদার আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা গড় ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পথে যে গ্রামগুলো পড়তে লাগল সেইসব গ্রামের লোকরাও এই অভূতপূর্ব মিছিলে সামিল হতে লাগল। জমিদাররা গ্রাম ছেড়ে শহরে পালল। স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। আর মিছিল জোর জোর কদম ফেলে জেলখানার দিকে এগিয়ে চলল। আর রাঘব রাও জেলখানায় তার জীবনের শেষ রাত্রিটি কাটাচ্ছিল। আর কিছুক্ষণ পরেই ভোর হবে।

ভোরের কিছু আগে রাঘব রাও সেই জামাটি পেয়ে তার বাবার দিকে এক প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল। বিস্ময় আনন্দ আর আবেগে ও মঞ্জরিত হয়ে উঠল। ওর বাবা যখন বলল, কি কষ্ট করেই না এই জামা তৈরি হয়েছে, আর দশ হাজার কৃষক এই জামা নিয়ে মিছিল করে জেলখানার ফটক পর্যন্ত এসেছে, তখন রাঘব রাও আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। ওর দু চোখে আশা ভবিষ্যত এবং উজ্জ্বলতার এক প্রখর আলোক চমক দিয়ে উঠল। সে ছোট্ট শিশুর মতো তার বাবার কাঁধের ওপর মাথা রাখল। আর ওর বাবা রাঘব রাও-এর মাথাটি দু'হাতে তার বুকে চেপে ধরল।

তারপর বিরাইয়া বলল, 'সময় আর বেশী নেই। তুমি জামাটা পরে নাও। এ শুধু আমার ইচ্ছে নয়, সারা গ্রামের ইচ্ছে। ইচ্ছে করলে

তুমি এর ওপর জেলের জামাও পরে নিতে পার।'

হেসে রাঘব রাও জেলখানার জামাটা খুলে ফেলল। 'তারপর সে খুব শ্রদ্ধা এবং সাবধনতার সঙ্গে রেশমের সেই লাল ফতুয়াটা পরতে লাগল। ও যখন জামা পরছিল, ওর বাবা ওর সামনে দাঁড়িয়ে গর্বের সঙ্গে ওকে দেখছিল। আর তার ছেলের মনেও অসংখ্য ভাবনার ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছিল। লাল রেশমের জামা পরে রাঘব রাও-এর মনে হল সে জামা পরেনি—জনগণের ঝাণ্ডা আর তাদের সংগ্রামের মহান নিশানা পরে রয়েছে। যেন সে তার নিজের রক্তে নিজেকে রঞ্জিত করেছে, নিজের খেত দিয়ে যেন গা ঢেকেছে—তার বাবা আর মার স্নেহ-মমতাকে পরেছে। উৎল্লাস আর আনন্দে রাঘব রাও-এর বুক ফুলে উঠল। আর লাল রেশমের কোমলতাকে স্পর্শ করে ওর মনে হল এ মসৃণতা—এ কোমলতা যেন গাছের শাখায় শাখায় পিল পিল করে হেঁটে-চলা হাজার হাজার রেশম পোকার মতো, মানব হৃদয়ের দীপ্যমান অসংখ্য নতুন আশা আর আকাঙ্খা মতো আর যুবতী-দের প্রথম তারুণ্যের নরম নরম আঙুলের চাপে ঘুরন্ত চরকার মতো। আর ঘুরন্ত চরকার ছায়ার নীচে তা যেন দোল-খাওয়া দস্তার ঝুমুর। লাল রেশমের জামার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে রাঘব রাও এক বিরাট গর্ব এবং ভালোবাসা নিয়ে তার বাবার দিকে তাকাল। আর তার মনে হল ভোরের আলো রাতের গালে এমন চর মেরেছে যে, তাতে জেলখানার সমস্ত লোহার গরাদ গলে যেন স্রোত হয়ে বয়ে চলেছে। শুধু দু-একটি গরাদ মাত্র কোন রকমে বেঁচে গিয়েছে। পরমহূর্তেই লোহার গরাদের ওপারে আকাশের গর্ভ থেকে সূর্য এমন ভাবে উঠে এল, যেন মার আঁচলের নীচ থেকে শিশু তার আদুরে চোখ মেলে তাকাচ্ছে। রাঘব রাও আনন্দে তার বাবাকে চীৎকার করে বলল, 'বাবা দেখ দেখ, জেলের গরাদও সূর্যকে রুখতে পারছে না।'

বিরাইয়ার চোখ জলে ভরে উঠল। এই পবিত্র জলধারাকে সে মুছল না। এই পবিত্র জলকে সে তার প্রবীণ মুখের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে দিল।

ওয়ার্ডার দিয়ে পরিবেষ্টিত তার ছেলে ফাঁসীর মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল। মিছিলের হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে 'জেলখানা-অভিযানে'র সঙ্গীত যেন জেলের প্রাচীরকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে আকাশ-বাতাসকে মথিত করে তুলল :

দেখ,
সারা তেলেঙ্গানা উঠেছে জেগে, জেগে।
তবলা বাজাও, বাজাও,
বিজয় মিছিলের দেখাও পথ.
লড়াই নাও জিতে,
সামিল হও, হও সামিল, অন্ধ্রের সন্তান।

জেলখানার বাইরে যে সঙ্গীত গমগম করছিল, সেই সঙ্গীত বিরাইয়ার ঠোঁটেও গুনগুন করে উঠল। গান গাইতে গাইতে বিরাইয়ার যে বিশ্বাস এবং প্রত্যয়, সেই বিশ্বাস এবং প্রত্যয় আরও দৃঢ় হল—যতদিন অন্ধ্রের কৃষক বেঁচে থাকবে, ততদিন তাদের প্রতিজ্ঞার ঝাণ্ডা এবং তাদের বিজয় এতটুকুও অম্লান হবে না। তাদের সন্তান-সন্ততিরাও চিরদিন বেঁচে থাকবে। আর তাদের গ্রামে দেশমুখরা আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

'যব খেত জাগে' প্রসঙ্গে কৃষণ চন্দর

আমি যদিও কৃষক নই, কিন্তু কৃষকদের মধ্যে থাকার সুযোগ আমার জীবনে অনেক ঘটেছে। আমার শৈশব এবং কৈশোর কৃষকদের মধ্যেই কেটেছে। কৃষকদের প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে জড়িত যে-সব কাজ—যেমন হাল চালানো নিরাই করা ধান বোনা ফসল তোলা, এসব তাদের কাছ থেকেই আমি জেনেছি। খেতে-খামারে যারা কাজ করে, তাদের প্রতি যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসা আমাকে ভারতীয় কৃষকরাই শিখিয়েছে। প্রকৃতির প্রতি যে ভালোবাসা এবং স্বতন্ত্র পরিবেশে থাকা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার যে বাসনা আমার অধিকাংশ গল্পে আপনারা পেয়েছেন, তা আমি কৃষকদের কাছ থেকেই পেয়েছি। তাদের সঙ্গে থাকার জন্যেই, তাদের ওপর যে সমস্ত অত্যাচার চলে, তা আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। আর বর্তমান জীবন-ব্যবস্থা পুরানো জীবন-ব্যবস্থার সঙ্গে জোট বেঁধে যেন তাদের ওপর পাথরের মতো চেপে বসে আছে। একেক সময় মনে হয়, আমি নিজেই তাদের ঘাড়ের ওপর এই জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছি। কারণ, গ্রামের যে শাসকশ্রেণী, সেই শাসক শ্রেণীরই আমি একজন সন্তান। আমার মনে হয়, বর্তমানে যা কিছু ঘটে চলেছে, এর জন্যে আমার বাবা-ই দায়ী। দায়ী আমার বাবার বন্ধুরা এবং তাদের বন্ধুরা। অন্যদিকে কৃষক এবং কৃষকের ছেলে-মেয়েরাই ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাদের বাড়ির দরজা আমার জন্যে ছিল সর্বদাই উন্মুক্ত। কিন্তু আমাকে থাকতে হত আমার উচ্চ বর্গ বাবার কাছে। সে জন্যেই কৃষকদের জীবনকে আমি দু-দিকের দুটি দরজা দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। পেরেছি, তার কারণ, আমি তাদের জীবন দেখতে চেয়েছিলাম। আর দেখতে বাধ্যও হয়েছি।

শোষণের এই যে ধারা, তা শুরু হয় এক দরজা থেকে আর শেষ হয় গিয়ে আর এক দরজায়। আর আমি সেই শোষণের ধারার শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত চোখ মেলে দেখতাম। সে সময় যে-জিনিসটা আমি বুঝতে পারতাম না, তা হচ্ছে নৈতিকতার দুটি সাম্প্রতিক রূপ। যার একটি সৃষ্টি করেছে অভিজাত বর্গ আর অন্যটি কৃষকরা। অভিজাতদের দামী এবং ভালো কাপড়-জামার প্রয়োজন, আর কৃষকদের এসবের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ভালো কাপড়-জামা পরলে তারা মর্যাদাশীল হয়ে উঠবে। আমাদের বাড়িতে এবং অন্যান্য অভিজাত বর্গের বাড়িতে প্রতিটি মানুষ দিনে দু-তিনবার ভর-পেট আহার করত, কিন্তু কৃষকরা যদি দিনে দু-তিনবার আহার করত, তবে তা অন্যায়—বেআদপী বলে মনে করা

হত। কারণ তাতে তাদের স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে এবং সেবা করার যে মনোবৃত্তি তা আর থাকবে না। কেউ শ্রম দিলে, সেই শ্রমের বিনিময়ে তার মজুরী পাওয়া অবশ্যই উচিত, কিন্তু আমরা তাদের বেগার খাটিয়ে নিতাম।

আমাদের অভিজাত বর্গের ঘরে মা-বোনের ইজ্জৎ আছে। তাদের ভীষণ সম্মান করা হয়। আমাদের এলাকার তহসিলদার হিন্দু। হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীকে পর্দানশীন করে রেখেছিল। কিন্তু কৃষকদের মা বোন এবং স্ত্রীদের বেইজ্জত করা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি আমার কিশোর বয়েসে একজন রাজা সাহাবকে দেখেছি। সে যখন তার জমিদারী পরিদর্শনে বের হত, এবং যে-সব গ্রামে যেত, সেই সব গ্রামের কিসান আর তাদের মেয়ে বৌ এবং শিশুদের বেঁধে আনাত। পুরুষ আর মেয়েদের পৃথক পৃথক সারিতে দাঁড় করাত। পুরুষদের জুতো দিয়ে পেটাত, আর মেয়েদের পাঠিয়ে দিত সারা রাতের জন্যে তার কর্মচারীদের তাবুতে। এ দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখেছি—একবার নয়, অজস্রবার। আর না জানি এ দৃশ্য কল্পনায় কতবার প্রত্যক্ষ করেছি।

এসব আমার শৈশবের ঘটনা। আমার এক কংগ্রেসী বন্ধু বলেন, চণ্ডিগড় ছাড়িয়ে সিমলা যাওয়ার পথে আজও এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে জলের প্রচণ্ড অভাব। এখানে দেহাতি মেয়েদের জলের জন্যে জঙ্গলের ঝরণায় যেতে হয়। আর এই জঙ্গল এক পাহাড়ি ঘাঁটির ওপর অবস্থিত। এই পাহাড় আর জঙ্গলের ভার যাঁর ওপর আছে তিনি একজন বিরাট উচ্চপদস্থ অফিসার। তাই ঝরণার জলে তেষ্টা মেটানোর জন্যে মেয়েদের উপঢৌকন দিতে হয় তাদের সতীত্ব—তাদের ইজ্জৎ। আর এই উচ্চপদস্থ অফিসার হচ্ছেন একজন কংগ্রেসী। শুধু তাই নয়, তিনি একজন কংগ্রেসী মিনিস্টারের ছেলে এবং একটি কংগ্রেসী পত্রিকার এডিটরও। তাঁর পত্রিকাতেই এই খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। এই ঘটনা পড়ে মনে হয়, কৃষকদের ওপর যে অত্যাচার চলে আসছে. তা এতটুকু কম হয়নি। আর কৃষকদের এই যে সমস্যা, সেই সমস্যা সারা ভারতবর্ষে কম-বেশী একই রকম। যুগ যুগ ধরে তাদের ওপর চলছে অত্যাচার। ইংরেজরা এ দেশে আসার আগেও ছিল, তাদের সময়েও ছিল, পরেও তেমনি চলছে। আমাদের কৃষকদের ওপর যারা অত্যাচার চালিয়ে আসছে. তাদের সঙ্গে কৃষকদের ঘনিষ্ঠতা খুবই কম। এই অত্যাচারীদের তারা জীবনভর ঘৃণা করে। কারণ যারা তাদের ওপর অত্যাচার করে আসছে, আগেও তাদের হৃদয় ছিল মূক ;—আজও তেমনি দয়া-মায়াহীন। তাই তাদের যখন বলা হয়, ভারতবর্ষ থেকে

ইংরেজ চলে গিয়েছে, এখন ফুর্তি কর, তখন কিন্তু তাদের চোখ আনন্দ আর খুশিতে জলজল করে ওঠে না। স্বাধীনতার যে আবেগ. সেই আবেগ তো আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়।

কৃষকদের ওপর এই যে অত্যাচার, সেই অত্যাচারের রূপ এত গভীরভাবে প্রোথিত দৃঢ় এবং সংগঠিত যে. এর শিকড়মূল হাজার হাজার বছর অতীত পর্যন্ত প্রসারিত। যাঁরা শহরে থাকেন, তাঁরাও কৃষকদের ওপর এই অত্যাচারকে আনন্দের সঙ্গেই সমর্থন করেন। নৈতিকতা সম্পর্কে এই যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, তা শহরেও অগোচর নয়। এমন বহু মানুষ আছেন. যাঁরা এই অত্যাচারকে অন্যায় বলে মনে করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কৃষকদেরও দোষারপ করেন। তাঁদের ধারণা কৃষকরা মূর্খ বেকুব পশু এবং নিষ্কর্মা। সভ্যতার অগ্রগতি সঙ্গে এবং জাগরণের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই,—নেই বলে তাদের এরকম ব্যবহার করা হয়। কারা তাদের মূর্খ করে রেখেছে, কারা তাদের বোকা আর বেকুব বানিয়ে রেখেছে, কারা তাদের সভ্যতার সমস্ত অগ্রগতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে? এসবের অনুসন্ধান করার সাহস তাঁদের মোটেই নেই।

যদি আমরা সত্যিসত্যি আমাদের জীবন এবং সমাজকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরপুর করতে চাই, তবে অবশ্যই আমাদের এসব কারণের অনুসন্ধান করার জন্যে সাহসী হতে হবে। অত্যাচারের সেইসব রূপকেও দেখতে হবে,—যা দু-এক বছর থেকে নয়, যুগ যুগ ধরে কৃষকদের ওপর চলে আসছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরাও কৃষকদের ওপর এই অত্যাচারকে দেখতে চাই না। অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে কোনরকম সৃজনশীল ভূমিকা নিই না, কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্যে কোনরকম মদতও দিই না। কিন্তু কৃষকরা যখন চারদিক থেকে তাদের ওপর সংঘঠিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেরাই উপায়হীন ভাবে নিজেদের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে,—নিজেদের জমি ভিটেমাটি মা-বোন এবং স্ত্রীর ইজ্জৎ রক্ষা করার জন্যে উঠে দাঁড়ায় এবং যখন এই অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্যে পথ খুঁজে বের করে, তখন ওদের ওপর জুলুম কায়েম রাখার জন্যে তাদের গ্রামে পাঠিয়ে দিই পুলিস আর মিলেটারি। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাঁক করে দিই তাদের ঘর-বাড়ি আর ফসল। আর তাদের ওপরই দোষারপ দিই, তারা হিংসাত্মক কার্যকলাপ করছে। যারা গুলি আর গ্যাস চালাচ্ছে, দিনরাত বল আর হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে, পুলিস আর ফৌজ পাঠাচ্ছে, তাদের মুখ থেকে এই দোষারোপ মোটেই শোভা পায় না।

'যব খেত জাগে'-তে কৃষকদের এই নতুন আন্দোলনকে আমি কাহিনীতে লিপিবদ্ধ

করেছি—যে আন্দোলন অন্ধ্রের মাটিতে অঙ্কুরিত হয়েছে। এর আগেও কৃষকরা নিজেদের অধিকারের জন্যে লড়াই করছে, কিন্তু সেই লড়াই-এ তারা শহরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু এবার অন্ধ্র এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন যেভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, তা শহরের মানুষের কাছে এবার সহানুভূতি পেয়েছে। এই সহানুভূতি পেয়েছে, তার সবচেয়ে বড় কারণ এবার সমাজের সবচেয়ে অগ্রগামী অংশ শ্রমিক-শ্রেণী এই আন্দোলনের ওপর স্থাপন করেছে তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও নেতৃত্ব। তাই তেলেঙ্গানার এই মোর্চা আজ সারা ভারতবর্ষের কৃষকদের মোর্চাতে পরিণত হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে এই প্রথমবার কৃষকদের সমস্যা তার নিজস্ব তীব্র গতিময়তা এবং নির্ভিকতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই সমস্যা এমন তীব্রতা এবং সত্যতা সামনে তুলে ধরেছে যে, বন্ধু এবং শত্রু—উভয়কেই স্বীকার করতে হচ্ছে, কৃষকরাই সঠিক। তাদের জমি তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিছু কিছু মানুষ এই আন্দোলনকে রাজনীতির আবরণে ঢাকতে চাইছে। তারা জমির বদলে দশগুণ ক্ষতিপূরণের কথা বলছে—যে ক্ষতিপূরণ ভারতবর্ষের গরীব কৃষকরা দশ পুরুষ ধরেও আদায় করতে পারবে না। অন্যদিকে শ্রীবিনোবা ভাবে চালাচ্ছেন ভূদান আন্দোলন। তিনি বলছেন, কৃষকদের জমি দান কর। দানের মাধ্যমে যদি কৃষক এবং গরীবদের সমস্যার সমাধান হত, তবে তা এতদিনে সমাধান নিশ্চয়ই হয়ে যেত। দানের নিয়ম হচ্ছে, একজন ততটুকুই দান করবে, যা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কিন্তু যখনই দানের অংশে নিজের প্রয়োজন অনুভব করবে, তখনই সে হাত গুটিয়ে নেবে।

'যব খেত জাগে'—বিপ্লবী চেতনাসমৃদ্ধ কৃষকদের কাহিনী—যে কৃষকরা তাদের জমির ওপর অধিকার রক্ষার জন্যে অত্যাচারীর হিংসার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এ কাহিনী সেই সব কৃষকদের নিয়ে লেখা, যারা স্বয়ং মেহনত করে। তাই শহরের শ্রমরত শ্রমিকশ্রেণীর মদত এবং নেতৃত্বকে তারা খারাপ চোখে দেখেনি। শহর এবং গ্রামের যে ফারাক এবং বিদ্বেষ অধিকাংশ সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে দেখা যায়, তার লেশ মাত্র তাদের মধ্যে ছিল না।

এই কৃষক জাগ্রত এবং সংগঠিত। তারা শুধু হাল চালাতেই চায় না, বই পড়তে এবং প্রেম করতেও চায়। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যে খাজাঞ্চিখানা, সেই খাজাঞ্চিখানার সঙ্গে গভীর ভাবে পরিচিতও হতে চায়। তারা অন্যের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে চায় না। তাদের বক্তব্য, এ জমির মালিক তো আমরা আজ থেকে নই। আমরা এ জমিতে শ্রম দিয়েছি—ফল ও ফুলে তা মঞ্জরিত

করে তুলেছি। এই শ্রমের জন্যেই তো চলছে সারা দুনিয়া। কিন্তু আমাদের ঘাড়ের ওপর চাপিয়া দেওয়া হয়েছে জায়গীরদারী প্রথার জোয়াল। আর আজ যখন আমরা আমাদের জমি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে সংগঠিত হয়েছি, তখন তোমরা বলছ, আমরা তোমাদের জমি তোমাদেরই দান করছি! একেই যদি ভূদান বল, তবে সমস্ত চোর আর ডাকাতকে দাতা বলে অভিনন্দিত করতে হবে। আর তোমরা বড় জোর আমাদেরই জমির একটা ছোট অংশই দান হিসাবে দিতে পার। খুব অল্প দিনের জন্যেই এ জমি আমাদের হাতে থাকবে। কারণ মহাজনী ব্যবস্থায় জমি বেশীদিন কৃষকদের হাতে থাকতে পারে না। ঋণগ্রস্থ কৃষকদের হাত থেকে সে জমি আবার ধীরে ধীরে মহাজন আর জমিদারদের হাতে চলে যায়। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এটাই হচ্ছে নিয়ম।

'যব খেত জাগে'—জাগ্রত কৃষকদের কাহিনী। স্থান অন্ধ্রের মাটি। এই কাহিনীর অবয়ব সৃষ্টি করতে আমাকে সাহায্য করেছে কৃষক আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক ইউনিটির সঙ্গে জড়িত কর্মীরা। এই আন্দোলন সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজ আমাকে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতে হয়েছে, কারণ অবস্থা মোটেই অনুকুলে ছিল না। আন্দোলন সম্পর্কে বহু তথ্য পেয়েছি তেলেগু ভাষার প্রখ্যাত নাট্যকার এবং কবি ভাস্কর রাও-এর কাছ থেকে। এই উপন্যাসের নায়ক 'রাঘব রাও'—এই নাম আমি অত্যন্ত সচেতন ভাবেই দিয়েছি। সে হচ্ছে গোলাম বা বিট্টি। তাই তার এই নাম হতে পারে না,—ভাস্কর রাও আমাকে সেরকমই বলেছিলেন। গোলামদের নাম—রামলু, থ্যায়ল, রঙডু ইত্যাদি রাখা হয়। রাঘব রাও নাম হতে পারে না। কারণ রাঘব রাও নাম হয় রাজপুতদের। রাঘবপতি তো আমাদের শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন।

সেজন্যে আমি স্থির করলাম, আমার নতুন নায়কের নাম নতুনই হবে। বদমাশরা কৃষকদের কাছ থেকে যে ভাবে ভালো ভালো জমি ছিনিয়ে নেয়, ঠিক সেইভাবে ভালো ভালো নামও তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আর আজ যখন কৃষকরা তাদের হারানো জমি আবার ছিনিয়ে নিচ্ছে, তখন তারা তাদের হারানো নামও কেন ছিনিয়ে নেবে না। সেজন্যে আমার নায়কের নাম রাঘব রাও। কারণ আজ যে গোলাম, সেই একদিন রাজা রামচন্দ্র হবে।

বর্তমানের গর্ভে 'যব খেত জাগে' কাহিনীর জন্ম হলেও, তা আগামীকালের কাহিনীও। আমি শুধু এর একটা সামান্য অংশই দেখেছি। আরও অনেক—অনেক কিছু দেখে লেখার ইচ্ছে আছে।

ভোর। বোধ হয় ছ'টার কাছাকাছি। খুব জোরে জোরে বাসের হর্ন বেজে চলেছিল। দু-তিন মিনিট ধরে হর্ন বেজে চলল। চৌকিদার আমাকে ডাকতে এল। খুব তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে ঔরঙ্গাবাদের সেই জীর্ণ মিনারের কাছে ছুটতে ছুটতে এলাম। বাস সেখানেই দাঁড়িয়েছিল। বাসের যাত্রীরা আমাকে সমানে গালিগালাজ করে চলেছিল। ঔরঙ্গাবাদের সেই জীর্ণ মিনারের মাথায় কোন এক কালে মশাল জ্বালানো হত। যাতে সেই মশালের আলোতে রাস্তা আলোকিত হয়ে ওঠে। এখন এই মিনার বাস স্টাণ্ডে পরিণত হয়েছে। বাস একেবারে মিনানের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল। যেন অনেকটা মিনারের গাঢ় ছায়ায় কোন বেশ্যা পুলিসের চোখ বাঁচিয়ে খরিদ্দারের জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি বাসে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে বাস ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে রৌদ্র-স্নাত মিনার অনেক পিছনে পড়ে রইল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল। জানি না, শুধু ঠাণ্ডা আমরাই লাগছিল কিনা! আমি একটা চারমিনার ঠোঁটের ডগায় চেপে বাসের যাত্রীদের দেখতে লাগলাম।

সবাই চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে আমাকেই দেখছিল। কারণ বাসে আমিই সবার পরে উঠেছি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার তহসিলদার সাহেবও ঠিক সময় মতো এসেছিল। এসে সবচেয়ে আগে ড্রাইভারের পাশে জায়গা দখল করেছে। পুলিস ইনেসপেক্টরও তাই। আর আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ, যে কোন অফিসার কোন ধনী ব্যক্তি বা জায়গীরদার নয়, আর যে ভোরে উঠে নাশতাও পর্যন্ত করেনি—খাবার-দাবারের কোন পোটলা-পুটলিও সঙ্গে নেই, সেই কিনা এল সবার শেষে—এত দেরীতে। ভাগ্যই বলতে হবে, ডাক বাংলোতে ছিলাম। আর হায়দ্রাবাদ থেকে এক

সুপারিশ পত্রও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। তা না হলে এতক্ষণ বাস আমার জন্যে দাঁড়াতই না।

বাসের যাত্রীরা তাই আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। ঘুরে ঘুরে আমার এলোমেলো চুল, আমার ফোলা ফোলা গাল, মোটা—পুরুষ্ট নাক, শুকনো ঠোঁট আর গভীর ভাবনার মধ্যে ডুবে-যাওয়া ময়লা-অপরিচ্ছন্ন চোখ দুটি দেখছিল। আমাকে দেখে তারা প্রত্যেকেই তাদের ভুল অনুভব করল। এমন একজন বেকার গরীব আর দেখতে চারশো বিশের জন্যে গাড়ি কেন দাঁড়াল? তহসিলদার বিড়বিড় করছিল। পুলিস-ইনেসপেক্টর ঠোঁট না খুলেই আমার মা-বোনকে উদ্ধার করছিল। আমি আশ-পাশের যাত্রীদের কাছে দেশলাই চাইলাম। কিন্তু তারা কেউই আমাকে দেশলাই দিল না। আর আমি ঠোঁটের ডগায় চারমিনার ধরে দেখতে লাগলাম। আর রাস্তার দু ধারের বিস্তীর্ণ প্রান্তর উপত্যকা এবং অনুর্বর ভূমি দেখতে লাগলাম, যে প্রান্তর উপত্যকা আর অনুর্বর ভূমির বুক যেন বাসের হৃদয়ের মতো মনে হচ্ছিল।

আমার পাশেই দুজন আপ টু ডেট ছোকরা বসে ছিল। বয়স বড় জোর তেইশ-চব্বিশ। এখনও চোখে-মুখে কলেজের ছেলে-মানুষীর ছাপ লেগে রয়েছে। নইম আর বসিম। দেখতে-শুনতে বেশ সুন্দর। খুব সুন্দর জামা-কাপড় পরেছিল। তাদের দুজনের কাছেই ক্যামেরা দামী ফাউন্টেন পেন দুরবিন এবং প্যাকেটে-করা ড্রাই খাবার ছিল। নইম পাইপ জ্বালাল। জ্বালিয়ে দেশলাই আবার পকেটে রাখল। আমি আমার ঠোঁটে-ধরা চারমিনার এপাশ-ওপাশ করে তাকে বললাম, 'হারামজাদা, ম্যাচিসটা একবার দে তো।'

ও খুব রেগে গেল। ছিটকে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপনি এসব কি যা-তা বলছেন? কে আপনি?'

বললাম, 'আমি তোমার বাপ। ম্যাচিসটা বাছাধন একবার সুর সুর করে দাও তো। তারপর বলছি, আমি কে।'

কিছুটা আশ্চর্য হয়ে কিছুটা আনমনা ভাবে কিছুটা রাগে আর

কিছুটা খুশিখুশি ভাব নিয়ে সে দেশলাইটা আমাকে দিল। সিগারেট জ্বালিয়ে দেশলাইটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর মুখ ঘুরিয়ে সিগারেটে জোর জোর টান দিতে লাগলাম। টানতে টানতে বাসের বাইরে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ একটা ভারি হাত আমার কাঁধ পাকড়িয়ে ধরল।

'শুয়োর কোথাকার।' দেখলাম নইম।

বললাম, আমার কাছে ম্যাচিস ছিল না, তোমাদের কাছে ছিল। তোমাদের কাছে চাইলাম, কিন্তু তোমরা দিলে না। তাই আমি তোমাদের সঙ্গে এই চাল চাললাম। চাল সফলও হল। তোমরা বোধহয় ভেবেছিলে, আমি তোমাদের ল্যাংবোট হব। কিন্তু এর আগে আমি তোমাদের কোনদিন দেখেনি। এই সফরের পর, তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হওয়ার কোন আশাও নেই। ইচ্ছে করলে তোমরা আমাকে বাস থেকে নামিয়ে দিতে পার।

বসিম মিচকি মিচকি হাসতে লাগল। সে নইমকে বলল, 'মনে হচ্ছে পাগল-ছাগল। ছেড়ে দাও বেচারাকে। তারপর আমাকে বলল, 'আর যদি তুমি কোনরকম ফাজলামি কর, তবে পুলিস-ইনেসপেক্টরের হাতে তোমাকে তুলে দেব।'

পুলিস ইনেসপেক্টর আমার মার নাম তুলে গালি দিয়ে বলল, আমাকে জানে মেরে দেবে। আমি তাকে বললাম, তুমি একাজ কিছুতেই করতে পারবে না, কারণ আমি হায়দ্রাবাদের নবাব অমুক জঙ্গ বাহাদুরের—যে জঙ্গ বাহাদুর, না কোন দিন বাহাদুর ছিলেন, না কোন দিন কোন জঙ্গ-এ অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁর সুপারিশ পত্র নিয়ে এসেছি অজন্তা দেখার জন্যে। এমন কে বাপের বেটা আছে, আমাকে রুখতে পারে। নবাবের নাম শুনে পুলিস ইনেসপেক্টরের কান খাড়া হয়ে উঠল। আর তহসিলদারের ঠোঁট দুটি ঝুলে পড়ল। নইম আর বসিম একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল; নবাব অমুক জঙ্গ বাহাদুরকে তুমি চেন?

আমি একটু চিড়মিড়িয়ে বলে উঠলাম, 'চিনি। আমি তার সঙ্গে

বসে মদ খেয়েছি। এক সঙ্গে বেশ্যা বাড়িতে গিয়েছে এবং উলঙ্গ হয়ে নেচেছি। তাঁর বিবির প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলাম। আমি তাকে জানি না, কি তোমরা তাঁকে জানো। কালকের তো কলেজের ছোকরা তোমরা।

'ভদ্রভাবে কথা বল।' সামনের সিটে-বসা একজন সুন্দরী মেয়ে কথাটি বলল। মেয়েটির নাম নজহত। ভালোবেসে, বিশেষ করে বসিম তাকে আদর করে 'নাজ' বলে ডাকছিল। আনন্দে খুব ডগমগ হয়ে উঠলে 'নাজো' বলে উঠত! আর মেয়েটিও যেন মুরগীর মতো পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কোঁকড় কোঁ করতে করতে আনন্দে বসিমের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল, যেন এখনই দিলেরা মুরগীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তুমি ওর ঝাঁপট সহ্য করার জন্যে তৈরি হয়ে যাও। আমি তীব্র ঘৃণার সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনি এখনি বসিমের পক্ষ নেবেন না।'

আমার এই কথায়, নজহতের পাশেই বসা তারই মতো সুন্দরী আর নরম তুলতুলে তার বোন নকহত ক্রোধে লাল হয়ে উঠল, 'এই বদমাসটাকে এখনই বাস থেকে নামিয়ে দাও, তা না হলে আমরাই নেমে যাব।'

নইম আমার গর্দান চেপে ধরে বলল, 'শালা শুয়োর।'

নজহত আর নকহতের বড় বোন—রিফ্ত, তার ভাবী স্বামী জমিল এবং রিফতের ভাই—সবাই আমাকে ঘিরে ধরল। এক বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেল। বাস থেমে পড়ল। সবাই মিলে আমাকে ধাক্কিয়ে বাস থেকে নামানোর চেষ্টা করতে লাগল।

আমি পকেট থেকে অমুক জঙ্গ বাহাদুরের দেওয়া সুপারিশপত্র বের করে বললাম, তোমাদের মধ্যে এমন কোন বাপের বেটা আছে, যে এই সুপারিশপত্র থাকা সত্ত্বেও আমার গায়ে হাত লাগাতে পার। এক একজনকে জেলে পাঠাব। এই নাও, পড়ে দেখ। এই পত্র নিয়ে আমি সব জায়গায় যেতে পারি।'

নইম বসিম আর জমিল বলল, 'রেখে দাও তোমার চিঠি।'

সুন্দরী মেয়েরা চুপ হয়ে গেল। মেয়েরা পরিবেশ খুব দ্রুত অনুধাবন করতে পারে।

তহসিলদার সাহেব বলল, 'আপনি এই মেয়েদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন আর পরবর্তী সফরে আর একটিও কথা বলবেন না, কথা দিন। আমি মানবতার খাতিরে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।'

আমি বললাম, 'আমি নেকড়ে বাঘ নই, একজন মানুষের মতোই আপনাদের কাছে ম্যাচিস চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনরা কেউই আমাকে একটা ম্যাচিস দেননি। যাক, আমি আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করছি। কারণ অমুক জঙ্গ বাহাদুর আমার একান্ত বন্ধু। আর সমস্ত জায়গায় তাঁর মান রক্ষা করা আমার কর্তব্য···।'

তাই আমি নজহত রিফত এবং নকহতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। বসিম. যে নজহতকে ভালোবাসত, তার কাছেও ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু বাসের মধ্যে আর কিছুই করা সম্ভব ছিল না। রিফতের ভাবী স্বামী, জমিলের কাছেও ক্ষমা চাইলাম। সে বার বার ওর সুন্দর আঙ্গুলগুলো আলতো ভাবে স্পর্শ করছিল। উল্লুক ভাবছিল, কেউ ওকে দেখছে না। আর রিফত, সে তার সৌন্দর্যে বিভোর হয়েছিল। আর তাকে পছন্দ করত যে নইম, সেই নইমের কাছেও আমি ক্ষমা চাইলাম। পুলিস ইনেসপেক্টর, তহসিলদার সেঠ দাহরজী বাজুরিয়া এবং তার গোমস্তা আর তার সঙ্গে লম্বা চুলওয়ালা ছোকরা চিত্রশিল্পী ক্লিনার ড্রাইভার—সবার কাছেই ক্ষমা চাইলাম। শেষে আমি নবাব অমুক জঙ্গ বাহাদুরের সুপারিশ পত্রটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। দেখে সবাই খুশি হয়ে আবার বাসে বসল। আর বাসও ছেড়ে দিল।

আমি সেঠ দাহরজী বাজুরিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনিও কি অজন্তা দেখতে যাচ্ছেন?'

'আজ্ঞে, হাঁ।'

'কিন্তু কেন, সেখানে তো কোন বিজনেস-টিজনেসের ব্যাপার নেই।'

সেঠজী হাসল, 'আমি অজন্তা থেকে শাড়ির ভালো ভালো

ডিজাইন তুলে নিয়ে আসি। তারপর সে ছোকরা চিত্রশিল্পীর দিকে ইশারা করে বলল, 'আমার সঙ্গে যাচ্ছে, ও সেখান থেকে ডিজাইন নকল করে আনবে। আর সেই ডিজাইন আমার মিলের শাড়ির ওপর ছাপা হবে। লাখ লাখ শাড়ি বিক্রি হয়। আমার মিলের শাড়ির ডিজাইনের খুব নাম।'

আমি ছোকরা আর্টিস্টের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলাম। সে আমাকে নমস্কার করল। আমি প্রত্যুত্তোরে তাকে নমস্কার করলাম। সে আমাকে আবার নমস্কার করল। আমি আবার যখন তাকে প্রতি নমস্কারের জন্যে হাত জোড় করতে গেলাম, ঠিক তখনই বাসটা একটা গাড্ডার ওপর গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বাসটা যেন ভূমিকম্পের মতো দুলে উঠল। নজহত সিট থেকে উছল খেয়ে আমার কোলের ওপর এসে পড়ল। আমি বসিমকে বললাম, 'তোমার মুরগীকে সামলাও।'

আমার কথা শুনে জমিল আমাকে আমার ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। আর নকহত বলল, এখন যেহেতু আমার কাছে ফলানা জঙ্গ বাহাদুরের আর সুপারিশ পত্র নেই, তাই মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকাই শ্রেয়। আর এদিকে মুরগী চুপচাপ তার নিজের সিটে গিয়ে বসল। বসে নিজের জামা কাপড় ঠিক করতে লাগল। আর আমি বুঝলাম, এই বাসের যাত্রীরা জংলী আর অসভ্য। তারা আমার এই সুন্দর—ছিমছাম সুক্ষ্ম ভদ্রতার উপযুক্ত নয়। তাই আমি চারমিনার ধরিয়ে বাসের জানালা দিয়ে বাইরের দুনিয়াকে দেখতে লাগলাম।

রাস্তার একটু দূরেই জাম গাছের সারি। আর তার ছায়ার নীচে পঞ্চাশ-ষাট জন কিসান দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অর্ধনগ্ন কালো কুচকুচে কিসানরা এক বেড় তৈরি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি। হৃদয়ে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর চোখে এক কঠিন পাথুরে ঝিলিক। দংশন করার মুহূর্তে জাত সাপের চোখ যেমন ঝিলিক দিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি যেন কিসানদের চোখগুলি জ্বলছিল। আর এই কিসানদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল নারায়ণ

রাও রেড্ডি।

রেড্ডি তাদের জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তোমরা জমির খাজনা দিতে নারাজ?'

কিসানরা বলল, 'না, দেব না।'

'জমিদারের যা পাওনা তাও দেবে না?'

একজন কিসান বলল, 'রাজা সাহেব, আপনি যদি মারাও যান শ্মশান-পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার খরচও আমরা দিতে নারাজ।'

কিসানটি বয়সে তরুণ। বলিষ্ঠ শরীর। আর মুষ্টি-বদ্ধ তার হাত।

রেড্ডি তাকে বেশ গভীর নজর দিয়ে দেখল। এবং রিভলবার বের করে তাকে সোজা ফায়ার করল।

তরুণ কিসানটি গুলি খেয়ে পড়ে গেল। পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিসানটির মাও তার ওপর হামলিয়ে পড়ল। দু হাত আকাশের দিকে তুলে বলল, 'গত বছর, রাজা সাহেব, তুমি আমার কুমারী মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছ। আমার কুমারী মেয়ে, যে ছোট্ট একটা সুখের সংসার বানাতো। আমার সেই মেয়েকে আমি আজ পর্যন্ত ফিরে পাইনি। শুনেছি, সে রাজার মহলে ঝি হয়ে আছে। সে এখন এক বেজন্মার মা। হায় আমার কুমারী—অবিবাহিত মেয়ে। আজ আমার ছেলেকেও মনিব তুমি ছিনিয়ে নিলে। পঞ্চায়েত, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কে রায় দেবে?'

কিসানরা লাঠি হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরল। রেড্ডি আবার ফায়ার করল। সমানে ফায়ার করতে লাগল। কিসানরা সামনে এগুতে এগুতে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে লাগল। একসময় গুলি শেষ হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে রেড্ডির মাথার ওপর এক জোর লাঠির ঘা পড়ল। ওর মাথার ঘেলু বাইরে ছিটকে বেরুল। কিসানরা বিষধর সাপের মতো তাকে সেখানেই দংশনে দংশনে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। তারপর তারা সেই বৃদ্ধার ছেলেকে ঘিরে দাঁড়াল।

বৃদ্ধা কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বলল, 'এ হচ্ছে আমার ছেলের রক্ত।

এই রক্তে আমার মেয়ের ওপর যে কলঙ্ক ছিল সেই কলঙ্ক ধুয়ে গেল।' সে তার আঙুল তার ছেলের প্রবাহিত রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বলল, 'আজ থেকে যে আর বাজার কিসান নয়,—প্রজার কিসান. আমি তার কপালে এই রক্ত তিলক পরিয়ে দেব। যারা আজ থেকে নিজের গ্রাম, নিজের বাড়ি ঘর নিজের খেত নিজের ফসল রক্ষা করবে, তাদের কপালে এই রক্ত তিলক জ্বল জ্বল করবে। তোমরা সবাই সামনে কদম বাড়াও।'

কিসানরা এক-একজন করে সামনের দিকে এগুতে লাগল। আর বৃদ্ধা তার ছেলের রক্তে আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে তাদের প্রত্যেকের কপালে রক্ত তিলক এঁকে দিতে লাগল।

আর আমাদের বাস সেই লাল তিলকে সজ্জিত কিসানদের ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূর এগিয়ে গেল।···

আমি সেঠ দাহরজী বাজুরিয়াকে জিজ্ঞেস বরলাম, 'এখন তো কাপড়ের কণ্ট্রোলে উঠে গিয়েছে। এতে তোমার কি লাভ?'

সে বলল, 'আমার কি লাভ? আমার মিল তো ম্যানেজিং এজেণ্টরা চালায়। আমি তো মাত্র আট-দশ লাখ টাকা এদিক-ওদিক করেছি। এজেণ্টরাই তো মজায় আছে।'

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা কিভাবে সম্ভব?'

তার গোমস্তা আমাদের দুজনের কথার মাঝখানে ফুরণ কেটে বলে উঠল, 'আমরা আগে থেকেই জানতাম কাপড়ের ওপর থেকে কণ্ট্রোল উঠে যাচ্ছে। গান্ধীজী যা চান, তার বিরোধিতা করে এমন কার সাধ্য আছে। ম্যানেজিং এজেণ্টরা বাজারে মাল ছাড়ে নি। মাস দু-তিন ধরে মাল আটকে রাখে। বাজারে কাপড় উধাও হয়ে যায়। চারদিকে তুমুল হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। গান্ধীজী জন-সাধারণের এই দুঃখ-কষ্ট দেখে কণ্ট্রোল তুলে দেওয়ার জন্যে চাপ দিলেন। কণ্ট্রোল উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে কাপড়ের দাম দু'শ গুণ বেড়ে গেল। শুধুমাত্র আমার মিলের ম্যানেজিং এজেণ্টরা দু মাসেই কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিল। এখন আবার আমাদের

শরিফ সরকার কাপড় কন্ট্রোল করে দিয়েছেন। তাই আমাদের আর পরওয়া কিসের?'

গোমস্তা ঘৃণার সঙ্গে এক নোংরা ধরনের ইঙ্গিত করে ফাইফ ফিফটি ফাইভ সিগারেট টানতে লাগল।

আমি সেই জানোয়ারের মতো শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ব্যবসায় তুমি কি পেয়েছ।'

সে বলল, 'আমি একজন শিল্পী। ছবি আঁকতাম। আর তা ছিল শিল্পের এক অসাধারণ নমুনা। যে নমুনা নিয়ে সমালোচকরা আলোচনা করত আর অন্য শিল্পীরা ঈর্ষার চোখে তাকিয়ে থাকত। সারা হুনিয়া আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। আমি ছিলাম শিল্পী সংঘের সভাপতি। কিন্তু শিল্প-কলা আমাকে একটি পয়সা—এক মুঠো ভাত, পরনের এক টুকরো কাপড় দেয়নি। হু'বেলা হু মুঠো খাব, তাও দেয়নি। স্ত্রীর অঙ্গ ঢাকার জন্যে যে একটি কাপড় কিনব, তার পয়সাও জোগাড় করতে পারিনি। ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাতে পারিনি। তুমি তো জানো শিল্পীও একজন মানুষ, অন্য মানুষের মতো তারও অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়।'

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কি হল? দর্শনিকতা ছাড়, অন্য কথা বল। এসব আমার জানা আছে।'

সে বলল, 'তারপর আমি এ খেয়াল ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দিয়ে সেঠজীর মিলে কাজ নিলাম। এখন আমি শাড়ির নমুনা অজন্তার ফ্রেস্কো থেকে নকল করি। আর তা সামান্য কিছুটা রদ বদল করে রঙ ভরিয়ে দিই। আমার নমুনা ভীষণ সাফল্য লাভ করেছে। প্রতি মাসে মিল মালিক আমাকে বারোশ' টাকা মাইনে দেয়।'

আমি তাকে বললাম, 'বুঝতে পেরেছি। তাহলে তুমি অজন্তাকে বেচছ। আর যেমন মিল মালিক গান্ধীজীকে বেচছে।

আর্টিস্টের মতো জানোয়ারটি একটি সুন্দর টোবাকো পাইপে আগুন ধরাল। ধরিয়ে সে তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে নীরব হয়ে গেল। কিন্তু সেঠজীর ভীষণ গোসা হল। সে আমাকে বলল, 'তুমি আমাকে

ইনসাল্ট করছ। জানো, আমি আহমেদাবাদের সব চেয়ে বড় সেঠ।'

আমি বললাম, 'আর আমি হচ্ছি, আহমেদাবাদের সব চেয়ে গরীব লোক। তোমাকে ইনসাল্ট করার অধিকার আমারই আছে।'

সেঠজী বলল, 'আহমেদাবাদে চল, আমি তোমাকে জেলে ঢুকিয়ে দেব। শালা, তুমি আমাকে কি মনে কর, সেঠ দাহরজী বাজুরিয়ার সঙ্গে সরকারের যে…।'

আমি তাকে বলাম, 'ভেবেছ, আমি ভয় পাচ্ছি! আহমেদাবাদে আমি অবশ্যই যাব, জেলে দিলে, আমি জেলের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে নাচব। আর তাতে রাষ্ট্র তোমাকেই ভয় পাবে। আর ভয়ে কাপড়ের দাম আরও আট শ' গুণ বেড়ে যাবে। জেলের বাইরেও লক্ষ লক্ষ উলঙ্গ মানুষ নাচবে। সেদিন তুমি তোমার সরকার আর তোমার ম্যানেজিং এজেন্টরা—সবাই আমাকে দেখে ভয়ে থরথর করে কাঁপবে, কারণ আমি যে আহমেদাবাদের সবচেয়ে গরীব মানুষ।'

রিফত উষ্মা প্রকাশ করে বলল, 'কি বাজে লোকের পাল্লায় না পড়েছি! পুরো সফরটাই মাঠে মারা গেল। শুধু রাজনীতি, রাজনীতি আর রাজনীতি! যেদিকে যাও, শুধু এই ফালতু রাজনীতির কথা। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে।'

জমিল নকহতকে বলল, 'এস, বরং কবিতার লড়াই খেলা যাক। তাতে মনটা হালকা হবে?'

মেয়েরা আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, 'বা, কী মজা!'

কবিতার এই লড়াই-এ থাকে সৌন্দর্য আর কবিতা, প্রেম আর ভালোবাসার কথা। এতে ওরা কেনই বা খুশি হবে না—যেন মুরগী আর মোরগ জোড় লেগে গিয়েছে, আর সিটে বসে বসেই তারা পাখনা ঝপটাতে লাগল।

আমি তাদের বললাম, 'কবিতার লড়াই শুরু করে দাও, কিন্তু…।'

আমার কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে রিফত বলল, 'তোমাকে কে অংশ নিতে বলছে, তুমি চুপ করে থাকতে পার না?'

বললাম, 'আমি তোমাদের মতো লোকদের মহফিলে কেন অংশ

নেব। আমার বক্তব্য হচ্ছে কবিতার লড়াই-এ নতুন নতুন কথা থাকা দরকার। যেমন…'

নজহত রেগে বলে উঠল, 'তোবা, আল্লা! আপনার কি মতলব বলুন তো?'

—'আমার বক্তব্য কবিতার লড়াই আপনারা আনন্দের সঙ্গেই খেলুন। আমি শুনতে থাকব। কিন্তু এই কবিতার লড়াই যেন শুধু গালিবের মধ্যেই আটক হয়ে না থাকে। এটাই মনে রাখবেন।'

বসিম মিষ্টি হেসে বলল, 'প্রস্তাবটা তো খুবই সুন্দর, কিন্তু খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।'

—'কোনই কষ্টকর ব্যাপার নয়, শুরু করে দাও।'

নজহত বলল, 'আমিই শুরু করছি। আমরা তিন বোন একদিকে, আর তোমরা তিনজন আর একদিকে।'

লখনৌ আনে কা বায়স নেহি খুলতা ইয়ানি
হবিসে সায়রো তমাশা, সো ও কম হো হমকো।

[আমি লখনৌতে কেন এসেছি, তা আমি জানি না। এখানে বেড়াতে বা ফুর্তি করার জন্যে আসিনি, কারণ তার প্রতি আমার কোন লালসা নেই।]

উত্তরে জমিল বলল,

ওঁয়া পহুচকর জো গশ আতা পয়হম হমকো,
সদরহ আহংগ জমী-বোস কদম হ্যায় হামকো।

[প্রেমিকার গলিতে পৌছে আমি বারবার মূর্চ্ছিত হচ্ছি, তার কারণ, এত বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়ে পড়া সত্বেও, আমার পা আমাকে এখানে টেনে এনেছে। আর তাই, আমার ইচ্ছে করছে আমার পা-কেই বার বার চুম্বন করি—তাই আমি মূর্চ্ছিত হচ্ছি।]

নকহত বলে উঠল,

ওঁয়া উসকো হোলে-দিল হ্যায় তো ইঁয়া ম্যয় হুঁ শরমসার
ইয়ানি ইয়ে মেরি আহ কী তাসীর সে ন হো।

[ওর হৃদয়ের যে অসুখ, তাতে আমি সরমে মরে যাই, কিন্তু এ

যেন আমার বুক ভরে নিশ্বাস টানার কারণ না হয়।]

বসিম নজহতের দিকে এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল,

বফাদারী বর্শতে উস্তবারী অস্‌সলে ইমাঁ হ্যায়,

মরে বুতখানা মেঁ তো কাবা মেঁ গাড়ো বরহমন কো।

[বিশ্বাস স্বাভাবিক ধর্ম। উপাসক যদি তার সারা জীবন মন্দিরেই কাটায় আর সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তবে তাকে কাবাগৃহেই দফন করা উচিত, কারণ এ তার অধিকার।]

ওরা গালিবের শের বা কবিতার স্তবক দিয়ে তাদের নিজের নিজের বক্তব্যকে তুলে ধরছিল—আর সেই বক্তব্যের ভেতর দিয়ে তাদের মনের ইচ্ছা—আকাঙ্খাকে ব্যক্ত করছিল। আর আমি ঝুকে বাসের বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বাস এক টিলার পাশ দিয়ে হু হু করে ছুটে গেল। সেখানে ছোট্ট একটা ঘর। আর টিলার ওপর একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। ঘরের বাইরে খেতের ওপর একটা বলদ মরে পড়ে ছিল। শকুন বলদটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। শুধু পড়ে রয়েছে তার হাড়ের ঢাঁচাটি। আর সেই ঢাঁচাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আওয়ারা কুকুর শকুন কাক আর শেয়াল। টিলার পাশে এই ঘরটিতে চেলাপতি আর তার স্ত্রী সুন্দরমা থাকত। সুন্দরমা ছিল সত্যি সত্যি অসাধারণ রূপবতী। ওর যৌবন কৃষ্ণচূড়া-ফুলের মতোই দোল খেত। চেলাপতি যেদিন ওকে প্রথম দেখে, সেদিন ও ওর ফসল-ভরা খেতের মাঝে দাঁড়িয়ে কাস্তে চালাচ্ছিল, আর গুনগুন করে গান গেয়ে চলেছিল। চেলাপতি সেই ফসল-ভরা খেতের পাশ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিল। সে সুন্দরমার দিকে তাকিয়ে রইল, আর ওর গানের উত্তর সে গান গেয়ে দিল। সুন্দরমার সঙ্গে চেলাপতির প্রথম পরিচয় এভাবেই হয়। আর তারা পরস্পরকে কাস্তে চালানোর কৌশল শেখাতে লাগল। আর ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ভালোবাসার এক বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। আর সেই বীজ তাদের খেতেই মাটি ফুঁড়ে অঙ্কুরিত হয়। তারা দুজন—, সুন্দরমা আর চেলাপতি আবেশে সেই অঙ্কুরিত বীজে জল সিঞ্চন করে,

চারদিকে আল বেঁধে দেয়, তীক্ষ্ণ নজর রাখে, পালন-পোষণ করে বর্দ্ধিষ্ণু করে।অবশেষে তাদের প্রেম মঞ্জরিত হয়ে ওঠে। তারপর তাদের দুজনের গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়, তারাও সেই ভালোবাসার ফসলের ভাগ পায়। আর সুন্দরমা এবং চেলাপতি টিলার কাছে এই ছোট্ট ঘরটি বানায়। ছোট্ট তিনটি খেত আর ফুলে ফুলে-ভরা কৃষ্ণচূড়ার এই গাছ যেন ওদের জীবনের এক সুন্দর—এক আনন্দের ছবি।

চেলাপতি আর সুন্দরমা সেই ছোট্ট ঘরে তাদের সংসার পাতল। তারা তাদের প্রেম আর শ্রম দিয়ে খেতে সৌন্দর্যের যে বাহার, সেই বাহারের সমন্বয় ঘটাল। অনুর্বর মাটিকে তারা ঘাম দিয়ে সিঞ্চিত করল। যেখানে রুক্ষ ধুলো উড়ত, সেখানে সবুজের সমাগম হল। যেখানে মেটেলী ক্ষুধা বিরাজ করছিল, সেখানে সোনালী ফসল জগমগিয়ে উঠল। বীজ ধরিত্রীর বুক কেঁটে বেরিয়ে এল। আর ঝলমল ফসলের মাঝখানে যেন সৌন্দর্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মাচানে কাস্তে চালাতে লাগল। ওর চুল হাওয়ায় ফরফর করে উড়ছিল। আর হাওয়ায় ওর শাড়ির আঁচল পতপত করে উড়ে চলেছিল। একজন মা যেমন তার শিশুর জন্যে, মাটি যেমন তার বীজের জন্যে এবং সৌন্দর্য যেমন সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে তার ফসলের জন্যে, তেমনি ভাবে সে গান গেয়ে চলেছিল। এমন এক অসাধারণ পরিবেশে গ্রামের প্যাটেল ওকে দেখল, দেখে মোহিত হয়ে গেল। যুগ যুগ ধরে প্রতিটি শস্য ভাণ্ডারে প্রতিটি ঘরে প্রতিটি বিয়ে-শাদীতে এবং প্রতিটি মেয়ের সতীত্বের ওপর প্যাটেলের অধিকার চলে আসছে। অর্থাৎ যা কিছু পছন্দ, সব কিছুতেই তার অধিকার আছে। সুন্দরমাকে তার ভালো লেগে গেল। সে অন্যকে বিয়ে করেছে তাতে কি হয়েছে? সে হচ্ছে গ্রামের প্যাটেল, সুতরাং প্রেমের ভাণ্ডারের ওপর তার অধিকার আছে। কিন্তু সুন্দরমা তা কেন মেনে নেবে? চেলপতি কিভাবে তাকে সেই ভাগ দেবে? প্যাটেল তাই সব রকম চালই চালল। সব রকম চালই বিফল হলে, প্যাটেল ঠিক করল, চেলাপতিকে খতম করে দেবে। কিন্তু চেলাপতিকে মারতে পারল

না। বরং স্বয়ং চেলাপতি তার দুজন গুণ্ডাকে খতম করে দিল। ফলে প্যাটেল থমকে গেল। সেইসময় প্যাটেলের আর কিছু করার ছিল না।

দিনের পর দিন কেটে গেল। আর সৌন্দর্যের বাহার ক্রমেই অনুভবহীন হয়ে পড়ল। গ্রামে আকাল পড়ল। চারদিক খরা। খেতে এক ফোঁটা জল নেই। ফলে চেলাপতির খেতে ফসল খুব কম হল। এত কম হল যে, প্যাটেল জমিদার আর মালির ভাগ দেওয়ার পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই চেলাপতি ঠিক করল, কাউকেই সে ফসলের কোন ভাগ দেব না। প্যাটেল ওকে বোঝাল। গ্রামের পঞ্চায়েত, যারা নিজেরাও ভুখা ছিল, ওকে খুব বোঝাল। কিন্তু চেলাপতি কারও কোন কথা শুনল না। তাই প্যাটেলের গুরগোং ওকে হত্যা করবে বলে হুমকি দিল।

রাত্রে চেলাপতি সুন্দরমার সঙ্গে পরামর্শ করল।

সুন্দরমা বলল, 'ওদের কথা মেনে নাও, সামনের মরশুমে আমার কোলে তোমার সন্তান খেলা করবে। আমরা আবার লড়াই করব।'

চেলাপতি বলল, 'সেই সন্তানের জন্যেই তো আমি ওদের কথা মানতে রাজি নই।'

সুন্দরমা বলল, 'তবে এ কিভাবে সম্ভব? গ্রামের একটি মানুষও আমাদের সাথে নেই। ওরা সত্যি সত্যি আমাদের মেরে ফেলতেপারে।

চেলাপতি বলল, 'তুমি ভয় পাচ্ছ?'

ও বলল, 'না, আমি আমার জন্যে ভয় পাচ্ছি না, ভয় পাচ্ছি তোমার জন্যে।'

চেলাপতি বলল, 'আমি মকতুমের সঙ্গে দেখা করছি।'

'মখতুম কে?' সুন্দরমা জিজ্ঞেস করল।

চেলাপতির চোখ দুটি ঝকমক করে উঠল, 'ও এক শামলা দুবলা নওজোয়ান। ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে কিসানদের সংগঠিত করছে। তাদের অধিকার এবং কি করণীয় তা বোঝাচ্ছে। গতকাল মখতুম আমাদের পাশের গাঁয়ে ছিল, কিভাবে জোট বাঁধতে হয় তা শেখাচ্ছিল। আমি আজকে তার কাছে যাচ্ছি, আর তাকে এ গাঁয়ে

নিয়ে আসব।'

ও গোপনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে সুন্দরমার ভরাট মুখের ওপর আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে বলল, 'তুই তো ভয় পাচ্ছিস না?

সুন্দরমা অর্ধ চন্দ্রের মতো ব্যাকুল চোখ তুলে বলল, 'সামলিয়ে যেও, না জানি দুশমনরা কোথায় লুকিয়ে-ছুপিয়ে আছে।'

দুশমনরা সত্যিই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল। ভোরে যখন চেলাপতি মকদুমকে নিয়ে ফিরল, দেখল ঘরের দরজা হাঙ্কা-উদাম। ঘরের বাসন-পত্র ভেঙে তছনছ করা। বলদ খেতে মরে পড়ে রয়েছে। আর মাচানের নিচে তার সুন্দরমা শেষ নিঃশ্বাস ফেলছে।

চেলাপতি সুন্দরমাকে দেখে চীৎকার করে উঠল, সুন্দরমা 'সুন্দরমা।'

সুন্দরমা তার আহত চোখ নিয়ে তার স্বামীর দিকে তাকাল। ওর হাতের মুঠোয় ফসলের এক ছোট্ট গুচ্ছ। ও বলল, 'তুমি এসেছ, যাক বেঁচে গিয়েছ। কিন্তু আমি আর বাঁচছি না। আমি ছিলাম একা, আর ওরা ছিল পঞ্চাশ জন।'

চেলাপতি সমুদ্রের গভীরে বয়ে-চলা লহরের মতো চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'সুন্দরমা, সুন্দরমা!'

'আমি একলা ছিলাম, আর ওরা ছিল পঞ্চাশ জন। ওরা আমার ধরিত্রীর বীজ নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছে।'

ও মারা গেল। আর ওর হাতের মুঠোয় ফসলের যে ছোট্ট গুচ্ছ ছিল, তা খসে পড়ল—যেন শস্য মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

চেলাপতি মকদুমের দিকে তাকাল। মকদুম তাকাল সুন্দরমার দিকে। তাকিয়ে শস্যের দানা মাটি থেকে তুলে নিয়ে বলল, 'চেলাপতি চল, এখান থেকে যাই। গ্রামের মানুষ শস্যের এই দানার জন্যেই অপেক্ষা করছে।'

চেলাপতি মকদুমের সঙ্গে চলে গেল। সে আর কোনদিন তার বাড়িতে ফিরে এল না। ওর ছোট্ট ঘরের দরজা তেমনি খোলা পড়ে রইল। সমস্ত বাসন-কোসন ঘরের মেঝেতে তেমনি ভাঙচুর অবস্থায় পড়ে রইল। খেত-খামার তেমনি উজাড় আর বন্ধ্যা, শকুন আর শেয়াল গরুর লাশ খেয়ে চলল।

চেলাপতি আর সুন্দরমার সংসার শূন্যতায় ভরে উঠল। শুধুমাত্র টিলার ওপর যে কৃষ্ণচূড়ার গাছ ছিল,তার প্রতিটি ডালে ডালে যেন কৃষ্ণচূড়ার ফুল হাসছিল। ঘর উজাড়। খেতে শস্যের একটি দানাও নেই। মাচান ভেঙে পড়েছে। সুন্দরমা মারা গিয়েছে। চেলাপতি চলে গিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণচূড়ার থোকা-থোকা লাল ফুল যেন এখনও তার আশা-আকাঙ্খা হারিয়ে ফেলেনি। ফুল কখনও নিরাশ হয় না। সে সব সময় মরশুমের প্রতীক্ষা করে।

বাস অনেক—অনেক দূর এগিয়ে গেল। আর টিলাটি বহু—বহু দূর পেছনে পড়ে রইল।

বসিম বলে চলেছে,

দিল মে জওকে-ওয়াসলো ইয়াদে-ইয়ার তক বাকী নেহি,
আগ ইস ঘর কো লগী এয়সী কি জো থা জল গয়া।

[হৃদয়ের তছনছ, এর থেকে আর বেশী কি হবে, বন্ধুর সঙ্গে মিলনের উদগ্রীব আকাঙ্খা আর তাকে স্মরণ করার তো আর বাকী নেই।]

নকহত বলল,

অহবাব চারাসাজিয়ে ওহশত ন কর সকে,
জিন্দা মে ভী খয়ালে এয়াবাঁ নবর্দ থা।

[প্রেমের যে উন্মত্ততা, সেই উন্মত্ততার চিকিৎসা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। জেলখানাতেও আমার কল্পনার যে উর্ননাভ, তা চীৎকার করে চলেছিল, আর তা যেন আমার পাগালামোকেই সত্য বলে প্রমাণিত করছিল।]

প্রতি উত্তরে নইম বলল,

এক-এক কতরে কা মুঝে দেনা পড়া হিসাব,
খুনে জিগর ওদীয়তে মিজগানে ইয়ার থা।

[আমার হৃদয়ের যে রক্ত, সেই রক্তের প্রতিটি বিন্দু আমাকে ঝরাতে হয়েছে। কারণ হৃদয়ের যে রক্ত, তা যেন বন্ধুর চোখের পলকের এক সঞ্চয়। আর সেই সঞ্চয়কে অবশ্যই উজাড় করে দিতে হবে।]

জমিল মেজাজে বলে উঠল,

আজ ওয়ঁা, তেগো-কফন বাঁধে হুয়ে জাতা হুঁ ম্যয়,

উজ্র মেরে কত্ল করনে মেঁ ও অব লায়েঙ্গে কেয়া ?

[আজকে আমি আমার সঙ্গে তলোয়ার এবং কফন নিয়ে চলেছি, এখন তাকে কতল করতে আমার আর কি সঙ্কোচ ?]

আমি বললাম, 'কবিতার লড়াই এতদূর এগিয়ে গিয়েছে যে, এখন একথা বললে নিশ্চয়ই কোন বাড়াবাড়ি হবে না ঃ

আইনা দেখ আপনা-সা মুহ লেকে রহ গয়ে

সাহব কা দিল ন দেনে পে কিতনা গরুর থা ।

[কাউকে ও তার হৃদয়ে স্থান দেয়নি বলে ওর অহংকার ছিল। কেন না কাউকেই ওর পছন্দ নয়—ওর যোগ্য মনে করে না। কিন্তু আয়নায় নিজের মুখ দেখে সে মোহিত হয়ে গিয়েছে। মনে করে ও অসাধারণ সুন্দরী।]

নজহত উষ্মা প্রকাশ করে বলল, 'আপনি চুপ করুন, আপনার এই কবিতার লড়াই-এ কেউই সামিল হবে না।'

বললাম, 'বেশ আমি চুপ হয়ে যাচ্ছি। কারণ সামনেই এলোরার গুহা দেখা যাচ্ছে।'

এলোরার গুহা।

এলোরা গুহা দেখার জন্যে আমি সবচেয়ে উদগ্রীব ছিলাম। পুলিস ইনেসপেক্টর আর তহসিলদারের জন্যে সেখানে মুরগীর ভুনা গোস্ত, রুটি আর ছুজন সুন্দরী মেয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নকহত রিফ্‌ত নজহত জমিল বসিম আর নইমের সঙ্গে গুহার মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখতে বেশ মজাই লাগছিল। গুহার মধ্যে অন্ধকার আর একান্ততা বিরাজ করছিল। আধ ঘণ্টা—পোনে-এক ঘণ্টার জন্যে সঙ্গী সাথীদের কাছ থেকে ছিটকে আলাদা হওয়ারও সুযোগ ছিল, পরে বলা যেতে পারে, 'আরে ভাই, ভুলভুলাইয়াতে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।' পেছনের জনকেও ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে। এলোরার গুহা সত্যিই বেশ সুন্দর আর মজার। কিন্তু আমি খুব সচেতন ছিলাম। ডাকবাংলো থেকে না খেয়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম। এখানেও কেউ

আমার জন্যে মুরগী এবং রুটির ব্যবস্থা করেনি। যে সুন্দরী মেয়েরা ছিল, তারা এক এক জনের সঙ্গে জুটে পড়েছে। আমার কপালে পড়েছে একজন গাইড, আর সেই তিনজন সুন্দরীর এক ভাই।

আমি গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি তোমার সাহায্য ছাড়া কি এই গুহা দেখতে পারব না?'

সে বলল, 'দেখতে পারবেন না কেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না।'

আমি রিফ্‌ত নকহত আর নজহতের ভাইকে বললাম, 'তুমিও এই গুহার মধ্যে তোমার বোনদের দেখতে পাবে না, আর তাদের হৃদয়াঙ্গমও করতে পারবে না।'

সে বলল, 'আপনি কি বলতে চান?'

বললাম তিন-তিনজন সুন্দরী বোনের ভাই হওয়া তোমার পক্ষে সর্বনাশ স্বরূপ। তিন জনেই তোমের চেয়ে বয়সে বড়। আজ পর্যন্ত ওরা তোমার ওপর শুধু ছড়িই ঘুরিয়েছে, আর তুমি তোমার নিজের প্রেমের জন্যে সাধনা করে চলেছ। যখন তুমি বড় হবে, আর ওদের বিয়ে হয়ে যাবে, তখন তুমি কোন অফিসে কেরানীর কাজ করতে করতে লোপাট হয়ে যাবে। তুমি তোমার বোনদের এতদিন ধরে পানের ডিব্বা ছাতা খাবারেব রেকাবি বয়ে বেরিয়েছ—এখনও বইছ। এরপরে তোমাকে তোমার স্ত্রীর সাজ-গোছের সরঞ্জাম বয়ে বেড়াতে হবে। সারা জীবন তোমাকে হীনমন্য হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আর এই হীনমন্যতার রোগ নিয়েই তোমাকে একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তোমার অবস্থা দেখে আমার করুণা হচ্ছে। তোমার নাম কি?

—'নাদির।'

'নাদির ভাই, আমার কথা শোন। এগিয়ে চলার হুকুম দিয়ে দাও। সাজ-সজ্জার যে জিনিসপত্র তা এখানেই ছেড়ে চলে যাও। তোমার বোনদের যারা প্রেমিক তারাই তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে নেবে। তুমি কেন মিছেমিছি কষ্ট করছ?'

নাদির বলল, তুমি বড্ড বেশী কথা বলছ, অথচ তুমি একটু আগেই আমাদের কাছে মাফ চেয়েছে। কিন্তু তুমি আবার তেমনি ধারা কথাবার্তা বলতে শুরু করেছ। এরকম কথাবার্তা বললে, তোমাকে ছেড়ে কথা বলব না, মার নাম ভুলিয়ে দেব।'

গাইড বলল, 'দেখুন, এ হচ্ছে রাজ নর্তকীর মূর্তি।'

সুডোল বাহু। জোয়ার-ভাঁটার মতো স্তন যুগল। নুইয়ে-পড়া কোমর, প্রসারিত পাছা, আর দেহের প্রতিটি অঙ্গে যেন এক বিবশতা ছড়িয়ে রয়েছে। যেন নৃত্যের এক চিরন্তন ছন্দ। এলোরার গুহায় এমন একটিও দেবী মূর্তি নেই, যে মূর্তির মধ্যে সৌন্দর্য নিহিত ছিল না। এমন কোন দেব মূর্তি নেই, যে দেব মূর্তিতে স্বার্থপরতার প্রাচুর্য ছিল না। হাঁ, সবই হচ্ছে দেব-দেবী। এ সবগুলিই হচ্ছে দ্রাবিড় সভ্যতার দেবতা, পরে হয়ে যায় ব্রাহ্মন্য সভ্যতার দেবতা। তারপর হয় বৌদ্ধ মতালম্বীদের উপাস্য। আর তারপর হয় জৈন ধর্মের উপাস্য। সাঁচে-ঢালা এই মূর্তিগুলির দেহ সৌষ্ঠব যেন মর্মর মূর্তির চেয়েও সুন্দর। রাম-রাবনের যুদ্ধ। মহাভারতের যুদ্ধ ক্ষেত্র। গৌতম বুদ্ধের অমর জ্ঞানরাশি, আর জৈনদের শাশ্বত উজ্জ্বলতা। ভারতবর্ষের চার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সমস্ত রকম উত্থান-পতন এই মর্মর মূর্তির মধ্যে খচিত হয়ে রয়েছে। আর এই মর্মরের মধ্যে আমরা সেই সভ্যতার মহানতা শ্রেষ্ঠতা—তার রোষ তার সংকীর্ণতা তার উদারতা এবং তার সমস্ত রহস্য এবং পতন দেখতে পাব। এই সংস্কৃতির এমন একটি দিকও নেই, যা শিল্পীরা আমাদের জন্যে সৃষ্টি করে রেখে যায়নি। শুধু-তা অনুধাববন করার জন্যে—পাঠ করার জন্যে চাই চোখ। আর সে চোখ অন্ধবিশ্বাসের চোখ, ধার্মিক অসহিষ্ণুতার চোখ নয়, চাই বুঝদার-উপলব্ধির চোখ। এমন এক দৃষ্টি—এমন এক চোখ চাই, যে দৃষ্টি, যে চোখ ভারতবর্ষের হৃদয় —তার মহত্ব আর তার যে দুর্বলতা তা বোঝে—অনুধাবন করে। এলোরার গুহা-চিত্রে এ দুটি দিকই বিদ্যমান।

এলোরার এক বিরাট মন্দিরে নর-নারীর যে প্রেম, সেই

প্রেমের সমস্ত লীলা—কলা-কৌশল এবং পরিবেশ অঙ্কিত করা রয়েছে। সেখানে আমি এক পুরুষের মূর্তি দেখলাম, যে পুরুষ একজন নারীকে চুম্বন করছে। দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

গাইড বলল, 'আপনি হঠাৎ কেন স্তম্ভিত হয়ে থমকে গেলেন?'

আমি বললাম, 'এ অশ্লীল। জীবন্ত, নগ্ন অশ্লীল।'

গাইড বলল, 'বেশ তবে এগিয়ে চলুন।'

এক-এক পা করে এগুতে লাগলাম। আর প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে যেন কামশাস্ত্র নিজেকে খুলে ধরতে ধরতে এগিয়ে চলল। এত ভালো আর অসাধরণ সুন্দর দৃশ্য এর আগে আমি আর কোথাও কোনদিন দেখিনি।'

'আমি গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এলোরাকে কী সেন্সর করা হয় না?'

গাইড বলল, 'এতো কোন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনা নয়। আমি অধিকাংশ সময়েই দেখেছি, সেসব জুটিরা এখানে আসে তারা এই মূর্তি দেখে পরস্পরকে আবেগে চুম্বন করে।'

আমি বললাম, 'প্রিয় নাদির, তুমি তোমার চোখের ওপর সেন্সর সিপ বসিও না, কারণ আমার ভয় হচ্ছে···।'

নাদির আমাকে গালি দিল। আর আমি এগিয়ে গেলাম সেদিকে, যেখানে একজন দেব আর দেবী উলঙ্গ নৃত্যতে গভীরভাবে মগ্ন।

নগ্ন—উলঙ্গ নৃত্য!

এই বিংশ শতাব্দীতেও নবাব আসমানজাহ বাহাদুর ইয়ারজঙ্গ বাহাদুর এক হারেম করে রেখেছেন। সেই হারেমে বেগম ছাড়াও আছে দাসী বেশ্যা বাঁদী হিজরের এক বিরাট পরিবার। যাদের সংখ্যা অগন্য। তিনি এক বিরাট জায়গীরদার। তাই তাঁর হারেমও বিরাট। হারেমের যে প্রধান রক্ষক, সে ছিল পুরুষ। তাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ সে বেকার হয়ে যাবে, তাই সে কিছুটা কাঁট-ছাঁট স্বীকার করে

নিয়ে হিজরে হয়ে যায়, যাতে তার পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণ অব্যাহত রাখতে পারে। নবাব আসমানজাহ বাহাদুর ইয়ারজঙ্গও তাকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চাকরীর স্থায়ীত্ব রাখেন, কারণ হারেমের নিয়ম হচ্ছে মেয়েদের এই ভরপুর বাজারে নিয়ম একটাই, যাতে তার পবিত্রতায় কোন কলঙ্কের দাগ না লাগে। নবাব সাহেবও এমন কোন তাগড়াই জোয়ান-মরদ ছিলেন না। যুগ যুগ ধরে, যে ভোগ-বিলাস চলে আসছে, সেই ভোগ-বিলাসের চিহ্ন তার দেহ আর মস্তিষ্কে অসংখ্য বৈশিষ্ট সৃষ্টি করে দিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষের যে হৃদয়, সেই হৃদয় তার আর নেই—তা শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও কুস্ত্ আর বিজলী, জল এবং ভাপের চিকিৎসা ইত্যাদির মারফত, সে এই বিরাট হারেমকে একটি মিথ্যা আবেশ বানিয়ে রেখে দিয়েছে।

নবাব আসমানজাহ বাহাদুর ইয়ারজঙ্গ বাহাদুরের বয়স পয়ত্রিশ বছরের বেশী নয়। কিন্তু দেখে পঞ্চাশের কম মনে হয় না। প্রথম তো, তিনি দিনের বেলা পড়ে পড়ে ঘুমোন, আর সারা রাত্রি জেগে কাটান। আর অল্প বয়স থেকেই জল খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। যখন তেষ্টা পায়, তখনই তিনি ফ্রেঞ্চ ওয়াইন খান। যখন খিদে পায়, তখন রিচ খানা খান। সাধারণ সাদা-মাটা খাবার তিনি কোনদিন খাননি। যখন মেয়েছেলের আবশ্যকতা অনুভব করেন, তখন এক থেকে এক সুন্দরী মেয়ে পেয়ে যান। তাঁর এই নাতিদীর্ঘ জীবনে, তিনি বিলাসিতার সমস্ত কিছু উপাদানই পেয়েছেন। আর তাই তিনি এত বড় একটা হারেম বানিয়েছেন।

এই হারেমের দু-চারজন ছাড়া কেউ-ই তাঁর বিবাহিত স্ত্রী নয়। সবাইকেই প্রায় 'জোর করে' নিয়ে এসে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ ঘর ছাড়া আওয়ারা ধরনের মেয়ে,কেউ বা বেশ্যাদের সন্তান-সন্ততি,—যাদের খুব অল্প দামেই সওদা করা হয়েছে। কাউকে কাউকে বা ভাগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আর এক বিরাট সংখ্যক এমন সব মেয়ে আছে, তাদের প্রজাদের ঘর থেকে সতীত্ব-কর স্বরূপ নিয়ে আসা

হয়েছে। প্রজাদের ভূমি-কর, জঙ্গলে কাঠ কাটার জন্যে ট্যাক্স, ঘর বানানোর জন্যে নজরানা এবং ফসলকে রক্ষা করার জন্যে ফসলের ভাগ দিতে হত। ঠিক সেই রকম 'সতীত্ব-কর'ও দিতে হত। এই ট্যাক্স পরিশোধ না করলে গ্রামের মানুষের যে পারিবারিক জীবনের আনন্দ, সেই আনন্দ রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। ফসল পেকে গেলে জমিদার তার প্রাপ্য নিয়ে নেয়। তেমনি মেয়েরা জোয়ান হয়ে গেলে, জমিদার তাদের ভাগ নিয়ে নেয়। খাজনা জমা হয় খাজাঞ্চি-খানায়, আর মেয়েদের পাঠিয়ে দেয় হারেমে। এই জায়গীরদারী ব্যবস্থা সামাজিক জীবনের এক নিয়ম, যেখানে সামান্যতম ঠোঁট খোলাও নিয়মবিরুদ্ধ। নবাব আসমানজাহ বাহাদুর ইয়ারজঙ্গ তার জায়গীরদারীতে এ-নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটতে দেননি।

'নবাব'-কেও সতীত্ব ট্যাকস-এর জন্যে হারেমে তুলে নিয়ে আসা হয়। 'নবাব' হচ্ছে মিরজার মেয়ে। মিরজা মুসলমান। মুসলমান হওয়ার জন্যেই সে নিজেকে এই অঞ্চলের বাদশা মনে করত। মিরজার পরনের কাপড় ছেঁড়া-ফাঁটা · তার স্ত্রীর কাছে এক জোড়ার বেশী দু' জোড়া কাপড় ছিল না। ওদের বাড়িতে ঘর ছিল একটাই, যে ঘরকে সে দিওয়ানেখাস এবং গোসলখানা—দু ভাবেই ব্যবহার করত। ও ছিল এই এলাকার বাদশাহ। বাদশাহ ছিল, তার কারণ এই এলাকার ও মুসলমান জায়গীরদারের প্রজা এবং কিসানও বটে। কে জানে ওর পূর্ব-পুরুষরা একদিন কি ছিল? কিন্তু এখন সে দরিদ্র আর ঋণের ভারে জর্জরিত। আর আর হিন্দু কৃষক ভূমিদাস আর খেত মজুরদের থেকে সে নিজের পৃথক অস্তিত্ব রাখত। কিন্তু অন্যান্য কৃষকদের মতোই তাকে কর পাওনা এবং জায়গীরদারী নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত সমস্ত ট্যাক্স ইত্যাদি ওসুল করতে হত। কিন্তু তা সত্বেও তার ঠাঁট-বাট ছিল সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। 'নবাব' ছিল তার একমাত্র কন্যা। বহুদূর পর্যন্ত তার রূপ আর সৌন্দর্যের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। মিরজা পাশের গ্রামের প্যাটেলের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা ভেবেছিল। বিয়ে হয়েও যেত। কারণ প্যাটেলের ছেলেরও তাকে পছন্দ ছিল।

কিন্তু মাঝখানে এসে দাঁড়াল—বাদ সাধল সেই বীভৎস 'সতীত্ব ট্যাক্স'। আর আসমানজাহ বাহাদুর ইয়ারজঙ্গের নজর গিয়ে পড়ল নবাবের ওপর। অন্যান্য এলাকাতেও ইয়ারজঙ্গের এই কৌশল যথারীতি জারি ছিল। অনেকবারই চেষ্টা হয়েছিল নবাবকে তুলে নিয়ে যাওয়ার, কিন্তু আল্লাহতাল্লা মিরজার ইজ্জত রক্ষা করে। মিরজার একমাত্র কন্যা নবাবের হারেমে অবশেষে স্থান পায়। মিরজার ধারনা নবাব তার মেয়েকে পছন্দ করে বিবি করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মেয়ে হারেমের অন্যান্য বাঁদীদের চেয়ে কোন অংশে ভালো ছিল না। প্রথম দিনেই তাকে ন্যাংটো করে নাচানো হল। মিরজা কোনদিনই এ কথা জানতে পারেনি। সে গর্ব করত, অবশেষে তো একজন বাদশাহর কন্যা বেগম হয়ে একজন বাদশাহর হারেমে আছে। যেদিন ওর কুমারী মেয়েকে উলঙ্গ করে আর আর মেয়েদের সঙ্গে মহফিলে নাচানো হল, সেদিন সে তা জানতে পারলে তার বাদশাহ সম্পর্কে তার কি ধারণা হত তা কে জানে! অবশ্য এ কথা ঠিক যে, নবাবের চিন্তা-ভাবনা একেবারে সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছে। প্রথমে তো সমস্ত কাপড় খুলে ফেলতে সে লজ্জা পাচ্ছিল, কিন্তু যখন তার সমস্ত জামা-কাপড় জোর করে এক এক করে খুলে ফেলা হল এবং তার গলায় মদ ঢেলে দেওয়া হল এবং তাকে যখন পনেরো-কুড়ি জন উলঙ্গ মেয়ের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল, তখন সে জানে না সে কোথায়—কি করেছে। বা তার সঙ্গে কি করা হয়েছে। নবাব আসমানজাহ শুধু মাত্র কয়েক ঘণ্টাই তার সঙ্গে ছিল, তারপর সে তাকে চিরদিনের জন্যে ভুলে গিয়েছিল। কারণ হারেমে অসংখ্য রকমের সুন্দর কাজ-কর্ম চলে। আর সেই কাজ-কর্মের মধ্যে একটি হচ্ছে, এলোরার গুহার মধ্যে যে রকম পাথরের মূর্তি আছে, ঠিক সেই রকম অর্থাৎ যা নর-নারীর কামশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। আর যাতে প্রতিদিনকার জীবনে তা ব্যবহৃত হতে পারে। এ ব্যাপারে নবাবকে আর একবার কষ্ট সহ্য করতে হল, কারণ এলোরা গুহার যে চিত্র সেই চিত্রের হুবহু একটি রূপ

আসমানজাহ বাহাত্বর ইয়ারজঙ্গের হারেমে চিত্রিত করা হল। নবাব আসমানজাহ এক একটি দৃশ্য পরিদর্শন করেন, আর তা এলোরায তোলা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেন। কোথাও কোন ভুল-চুক দেখলে, তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই সংশোধন করে দেন। যে বাগিচায় নবাব দাঁড়িয়ে ছিল, সেই বাগিচাতেও কয়েকটি ত্রুটি তাঁর চোখে পড়ে, আর সেই ত্রুটি ঠিক করার জন্যে তিনি সামনে এগিয়ে যান, তখন নবাব তার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গলা ফাঁটিয়ে চীৎকার করতে থাকে। নবাব আসমানজাহ-র মুখ আর গর্দানে এক ঝাপট পড়ে। কিন্তু যার পেছনে আল্লাহতাল্লা আছে তাকে কে মারে। নবাব বেঁচে যান, কিন্তু বেচারা নবাবকে এমন ধোলাই করা হয় যে, বেশ কয়দিন ও অন্ধ কুঠরির মধ্যে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে। যখন ওর মূর্চ্ছা ভাঙে, তখন তার ওপর আট-দশজন মরদকে ছেড়ে দেওয়া হয়— যেন ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে শিকার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এরপর নবাব হারেম থেকে পালাবার জন্যে দু-তিনবার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবারই সে অসফল হল। আর প্রতিবারই পড়ল তার ওপর চাবুক। অবশেষে ও হারেম থেকে একদিন পালল। পালানের সময় পিস্তলের গুলি ওর বাঁ হাত ভেদ করে চলে গেল।

কয়দিন ধরে এক খেত থেকে আরেক খেতে এমনিভাবে আত্মগোপন করে রইল। ওর বাবা ওকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করল। গ্রামের অন্যান্য মানুষও তাকে আশ্রয় দিতে সাহস পেল না। সেই মুসলমান প্যাটেলের ছেলেও তাক গ্রহণ করতে রাজী হল না। ইতিমধ্যে বাঁ হাতের ঘা ভীষণ আকার ধারণ করল। কিন্তু যখন কৃষকদের মোর্চা গঠনকারীরা ওর সমস্ত কাহিনী শুনল, তখন ওরা ওর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। হাসপাতালে ওর হাত কাটা হল। ভালো হয়ে গেলে ও কৃষক বাহিনীতে যোগ দিল। ও এখন আর পর্দানশীন নয়। কারণ বিয়ের আগেই ওকে উলঙ্গ নাচতে হয়েছে। আর এখন ও ওর বাদশাহজাদা সম্পর্কে যা কিছু নিখুঁত সত্য, তা ওয়াকিবহাল। এখন সে কৃষকদের জাঠার সঙ্গে গ্রামেরপর গ্রাম পুরুষদের মতোই ঘুরে

ঘুরে, কৃষকদের সংগঠন তৈরি করছে। আর বাদশহজাদার যে প্রবঞ্চনা এবং মিথ্যাচার, সে সম্পর্কে মানুষকে জানাতে লাগল। আর মানুষ তার কাটা বাহু, তার লুণ্ঠিত সতীত্ব তার আহত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকত। আর বুঝতে লাগল, হাজার হাজার বৎসর ধরে তাদের জীবনে সঞ্চিত যে ভয়ানক ঘৃণা, যে ঘৃণা সাচ্চা ঘৃণাতে রূপান্তরিত হচ্ছে, আর যা তাদের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে দাঁড় হওয়ার জন্যে প্রেরণা যোগাচ্ছে,—এবং দক্ষিণাঞ্চলে সমস্ত খেত-খামারে যেন এক বিদ্রোহ—এক বিপ্লবের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়েছে।

সমস্ত কিসানরাই নবাবকে 'বড় দিদি' বলে ডাকত। অথচ ওর বয়স বড় জোর সতেরো বছর। কিন্তু গত দু বছরে ও তিন-চার হাজার বছরের অর্থশাস্ত্রকে অধ্যয়ন করে ফেলেছিল। আর বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক দিক থেকে ও থুরথুরি বৃদ্ধার মতো হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলে, ও এই ছোটাছুটি করতে করতে একবার এলোরাতে আসে। এলোরার মর্মর মূর্তি দেখে ও প্রসন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অঝোরে কাঁদতে থাকে। যারা এলোরা দেখেছে, তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আবার এই কান্নার অর্থও বোঝে।

আমি নগ্ন নৃত্যের দর্শাবলী দেখছিলাম। এমন সময় বাসের হর্ন বেজে উঠল। আমি আনমনা হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম ইনেসপক্টর সাহেব আর তহসিলদার গায়ে গা লাগিয়ে বাসের সিটে বসে আছে। ওদের ঠিক পেছনের সিটে আমি বসে পড়লাম। কিন্তু সুন্দর জুটিরা বেশ দেরীতে এলোরা থেকে বেরুল। ওদের চোখ-মুখ লাল আর চুলগুলো এলোমেলো। ওরা খুবই লজ্জিত হল। ওরা বাসে বসলে, আমি বললাম, 'বোন নজহত, আমি আপনাকে এক বাদশাহর কন্যার কাহিনী শোনাতে চাই—যে বাদশাহর কন্যা এলোরার গুহা দেখে খুব হাসে আবার অঝোরে কাঁদে। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করুন, সে কেনই বা হেসেছিল, আর কেনই বা কেঁদেছিল।'

নজহত বলল, 'আমার জিজ্ঞেস করার কোন দরকার নেই,'

তারপর সে ড্রাইভরকে বলল, 'জলদি জলদি বাস ছাড় জী।'

বাস ছাড়লে আমি বকবক শুরু করলাম, 'শুনুন নজহত মেম সাহেবা, এক বাদশাহর মেয়ে···

ও বলে উঠল, 'বর্তনের মধ্যে থাক তোমার শাহজাদী, আর তুমি যাও চুলোয়।'

আমি বললাল, 'আপনারা অজন্তা আর এলোরা দেখতে এসেছেন, অথচ এর সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক কাহিনী শুনতে আপনাবা নারাজ?'

নজহত বলল, 'আমারা এখানে আনন্দ আর ফুর্তি করতে এসেছি, তোমার মতো মগজ সাফাই করতে আসিনি।'

আমি বললাম, 'মিস নজহত্, আপনি যে শ্রেণী থেকে এসেছেন, সেখানে টাকা ছাড়া আর কিছুর ওপর ভালোবাসা—মমতা নেই। আপনাদের শ্রেণীর কাছে কোন জিনিসরই কোন মহত্ব নেই—সবই সপাট। সাম্রাজ্যবাদ আর প্রজাতন্ত্রের মধ্যে আপনাদের কাছে কোন প্রভেদ নেই। হিটলার আর স্তালিন আপনাদের কাছে সমান। আপনারা যে শ্রেণীর, সেই শ্রেণী জীবনের প্রতিটি বাঁকে দাঁড়িয়ে মানব-ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফরাসী বিপ্লব থেকে যদি আজ পর্যন্ত দেখা যায়, দেখব, আপনাদের কোথাও ঠাঁয় নেই। আপনারা সামান্য কটি টাকার জন্যে জনসাধারণ থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন। এখনও আপনারা তাই-ই করছেন, তাই আমি বলছি···।'

নইম আমার নাকের সামনে তার ঘুসি বাগিয়ে ধরে বলল, 'বকসিং জানি। বেশী ফালতু কথা বললে, দু' ঘুসিতেই সর্ষে ফুল দেখিয়ে ছাড়ব।'

আমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ফিরিয়ে নিয়ে বাসের বাইরে খুব জোরে থুথু ফেললাম। পুলিস ইনেসপেক্টর আর তহসিলদার ক্রোধে আমার দিকে তাকাল। আমি আবার থুথু ফেললাম। ওরা বাসের নাক বরাবর রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। আর বাসের মধ্যে আবার শুরু হল কবিতার লড়াই লড়াই খেলা।

জলিল বলল,

কিউ জল গয়া না তাবে রুখে ইয়ার দেখ কর,

জলতা হুঁ আনী তাক্‌তে দীদার দেখ কর।

[প্রেমীর চেহারার যে কান্তি, তা দেখে আমার জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমার দেখার যে শক্তি তা অত প্রখর নয়, তাই আমি গর্ব করতে পারি না]

নজহত বলল,

রুখে নিগার সে হ্যায় সোজে জবা দানিয়ে শমাঁ।

হুই হ্যায় আতিশে গুল আবে জন্দগানিয়ে শমাঁ।

[প্রেমে খুব দ্রুত সাফল্য লাভ করে না। ধৈর্য্য ধরতে হয় আর অভিলাষও উন্মুখ হয়ে ওঠে। জানি না মৃত্যু পর্যন্ত হৃদয়কে কীভাবে সামলাব, কারণ সফলতা তো মৃত্যুর পরেই আসে]

নইম প্রত্যুত্তোরে বলল,

আশকী সবর তলব আউর তমন্না বেতাব,

দিল কা কেয়া রং করু খুনে জিগর হোনে তক।

[প্রেমের আদলের যে সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্য দেখে প্রদীপের ঈর্ষা হয়, তাই সে সর্বদা জ্বলে, অর্থাৎ সেই ফুলের সৌন্দর্য আগুনের যে প্রদীপ তার কাছে অমৃত হয়ে যায়]

বসিম বলল,

দিল দিয়া জান কে কিউ উসকো বফাদার অসদ,

গলতী কী-কি জো কাফির কো মুসলমাঁ সমঝা।

[হে অসদ, (গালিবের প্রথম উপনাম) ওকে সাচ্চা ভেবে কেন নিজের হৃদয় উৎসর্গ করলে! কি ভুলই না করেছ নাস্তিককে আস্তিক ভেবে।]

জানি না, রিফত জবাবে কি উত্তর দিয়েছিল। কিন্তু আমার হৃদয়— আমার দিল কাফের আর মুসলমানের মধ্যে যে সমস্যা, সেই সমস্যার অতলে তলিয়ে গেল। নাজ হায়দার ছিল একজন মুসলমান, আর অজন্তার যে গ্রাম, সেই গ্রামের কাফেরের মেয়েকে সে ভালোবাসে।

নাজ হায়দার অজন্তার যে কসবা, সেই কসবার ডাকবাংলোতে এসে ওঠে। নিয়ম মাফিক ও দু পেগ মদ খেয়ে বেড়াতে বের হয়। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে ও বাঁধের জলের ধারা দেখল। তারপর সে একাকী খেতের দিকে যে পাকদণ্ডী গিয়েছে, তা ধরে হেঁটে চলল। পথেই কাফেরের মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যে ওর দিল খতরা করে দিল। দেখতে যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি ঢলঢল তার যৌবন। নাজ হায়দার ভেবেছিল ওকে পয়সা দিয়ে কেনা যাবে। কিন্তু বুঝল ওকে কেনা অত সহজ নয়। সে খুব হতাশ হয়ে গেল। অজন্তা যে গ্রাম, সে গ্রামে সে দুদিনের জন্যে এসেছিল। কিন্তু ও পাঁচ-ছ দিন সেখানে থেকে গেল। সে এক চা কোম্পানীর এজেন্ট। প্রথম দু-তিন দিনের মধ্যেই ও কসবার দোকানদারদের মধ্যে চায়ের সমস্ত প্যাকেট বিক্রি করে দিল। বিক্রি করে দেওয়ার পর ওর এখানে আর থাকার কথা নয়। কিন্তু কাফেরের মেয়ের যে তীক্ষ্ণতা—হৃদয় এপার-ওপার করে দেওয়া যে চাহনী, সেই চাহনী ওকে এখান থেকে যেতে দিল না। সে আরও তিন দিন সেই ডাকবাংলোতেই তার হৃদয়ের প্রেমের যে উদভ্রান্ত প্রসন্নতা, সেই প্রসন্নতা নিয়ে কাটাল। কাফেরের মেয়ে তার হৃদয়ের এই আকুল কথা হয়তো বুঝতে পারেনি, কিন্তু ওর বাবা বুঝতে পেরেছিল। তাই সে নাজ হায়দারকে তার ভুল শুধরিয়ে দেয়। কারণ সে ব্রাহ্মণ। ওর মেয়ে একজন ব্রাহ্মণের কন্যা। নাম শাস্তা। আর চা বিক্রেতার নাম নাজ হায়দার,—সে মুসলমান।

নাজ হায়দারের মনের অভ্যন্তরে শাস্তা এমন ভাবে প্রবেশ করছিল, যেন নরম মাটিতে গাছ তার শিকড়-মূল প্রসারিত করে ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। এমনই গহীন সবুজ প্রেম ছিল নাজ হায়দারের। শাস্তা ওর ভাষা বুঝতে পারত না, কিন্তু না বুঝেও যেন ওর অন্তরের কথা বুঝতে লাগল। আর এই অন্তরের কথা, ধর্ম এবং জাতি থেকে অনেক অনেক উঁচুতে অধিষ্ঠিত। প্রতিদিন রাত্রে শাস্তা ওর জন্যে খাবার নিয়ে আসত। শুধু সবুজ বজরার দুটি রুটি আর বেগুন ভর্তা। ব্যাস আর কিছু নয়। এর চেয়ে ভালো খাবার

এর আগে আর কোন দিন কোন ডাকবাংলোতে নাজ হায়দার খায়নি। প্রতিদিন সে এই খাবারের কথাই বলত, আর শাস্তাও রাত্রে ওর জন্যে এই খাবারই নিয়ে আসত। খাবার তার টেবিলের ওপর রেখে চোখ মাটির দিকে নামিয়ে নিঃশব্দে চলে যেত।

নাজ হায়দার পাঁচ দিন ডাকবাংলোতে ছিল। তারপর ওকে যেতে হল। কারণ ও ছিল চা-কোম্পানীর এজেণ্ট। কোম্পানী কাজ চায়—মুনাফা চায়, কিন্তু প্রেম চায় না। কিছুদিন বাদে নাজ হায়দার আবার এই গ্রামে ফিরে আসে। আর এবার সে সাত দিন এখানে কাটায়। এবার সে মারাঠী ভাষাও দু-চারটি শিখে নিয়েছে, আর শাস্তার কাছে লোকগীতির অর্থ জিজ্ঞেস করে। এবার যখন সে আসে, তখন বেগুনের মরশুম নয়। তাই সে সবজি-রুটির সঙ্গে মশলা-মাখা আলু-ভত্তা খেত। তারপর পেট ভরে ঠাণ্ডা জল খেয়ে শাস্তার রান্নার খুব প্রশংসা করত। আর শাস্তা ওর দিকে চেয়ে সুন্দর মিষ্টি হাসত—যেন ওকে করুণা করছে। এবারে চৌকিদারের গলার স্বরও ছিল অনেক বেশী নরম, কারণ সবার ওপর সে ছিল ব্রাহ্মণ। তাই আট দিন পরে নাজ হায়দার সেখান থেকে ফিরে গেল।

দু-তিন মাস ধরে নাজ হায়দার আশ-পাশের নানা গ্রামে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল। অবশেষে সে আবার অজন্তার গ্রামে এল। এসে উঠল সেই একই ডাকবাংলোতে। আর সেই একই চৌকিদার হুকা গুড়গুড় করে টেনে চলেছে। ওকে দেখে চৌকিদার খুব আপ্যায়ন করল। কিন্তু ও শাস্তাকে কোথাও দেখতে পেল না। নাজ হায়দার জিজ্ঞেস করলে, বলল, ও আগামীকাল আসবে। সারা রাত সে জেগে কাটাল। পরের দিন ও সারা দিন-ভর প্রতীক্ষা করতে লাগল। রাত্রে ও এল। থালায় করে বজরার দুটি রুটি নিয়ে এল। রুটি দুটিতে মাখন মাখা। আর ছিল মরিচের আচার এবং বেগুন-ভত্তা। ও নিঃশব্দে নাজ হায়দারের সামনে খাবারের থালাটি রাখল।

নাজ হায়দার থালাটি একদিকে সরিয়ে রেখে বলল, 'তুমি

কোথায় ছিলে, কাল রাত থেকে আমার চোখে ঘুম নেই।' ওর কণ্ঠে যেন ক্রোধের আভাস ছিল।

শান্তা মাথা হেঁট করে অঝোরে কাঁদতে লাগল। ওর চোখের জল টপ টপ করে মেঝেতে পড়তে লাগল।

নাজ হায়দার ওর রঙিন শাড়ি আর ওর লাল টিপের দিকে তাকাল। লাল টিপ ওর কপালের ওপর জ্বলজ্বল করছিল। দেখতে দেখতে ওর হৃদয়—ওর মন ভরে উঠল। আর ওর চোখ দিয়ে নীরবে দরদর করে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। যেন এই বিশ্ব সংসারে ওদের দুজনের জন্যে আর কোন কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়নি। আসমান আর ধরিত্রী যেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে—কোথাও জলের একটি বিন্দুও আর নেই।

নাজ হায়দার ওকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমাদের কি হবে?'

শান্তা বলল, 'গত মাসের চাঁদের দশমীতে···।'

গত মাসের চাঁদের দশমীতে নাজ হায়দার নাচনীল কসবায় ছিল। সেই রাতে তার চোখে ঘুম ছিল না, কারণ সে-পাড়ায় তখন বিয়ের উৎসব চলছিল। আর সারা রাত ধরে মেয়েরা বিয়ের গান গাইছিল। গান শুনতে শুনতে তার হৃদয় ব্যথায়-কান্নায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল। ভোরের দিকে ওর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। সেই ঘুমের ঘোরে যেন ওর মনে হল, শান্তা ওকে চীৎকার করে ডাকছে। ডেকে বলছে, 'শীগগির এসো, শীগগির এসো। তুমি এখন কোথায়?' ও চমকে উঠে বসল। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

নাজ হায়দার শান্তাকে বলল, 'আমারই ভুল হয়েছিল, তুমি আমাকে ডেকেছিলে। কিন্তু আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারিনি।'

শান্তা বলল, 'আমি হাজার-লক্ষবার মনে মনে তোমাকে ডেকেছি। সারা জীবনভরই তোমাকে ডেকে যাব। হও না তুমি মুসলমান, আর আমি ব্রাহ্মণ। বাবা বলেন, তোমার আর আমার মিলন কোনদিনই হতে পারে না—কোনদিনই সম্ভব নয়।'

নাজ হায়দার অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। আট-ন বছর ধরে সে তার আর শান্তার মাঝখানে একটি সাঁকো বানিয়ে চলেছিল। কিন্তু সে সাঁকো বানানো কোনদিন শেষ হয়নি। কারণ তার গোড়ায় ছিল গলত। আট-ন বছর ধরে ও শান্তার বাবার কাছে ওর হৃদয়ের ইচ্ছা ব্যক্ত করার চেষ্টা করে এসেছে। আর এই আট-ন বছর ধরেই শান্তার বাবা ওর কাছে তার হিন্দুধর্মকে জাহির করে এসেছে। তাই লেন-দেন আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে এই সাঁকো ধর্মের ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারেনি। তার সেই ভিত ধ্বসে গিয়েছে। নাজ হায়দার বুকের বাঁধন ভেঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠল। আর শান্তা তার শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগল।

নাজ হায়দার বলল, 'শান্তা, আমি চলে যাচ্ছি, আর কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।'

শান্তা হকচকিয়ে গেল। বলল, 'তুমি এখন কি করবে ?'

নাজ হায়দার বলল, 'আর চা বেচব না। এখন থেকে আমি নতুন নতুন গান রচনা করব। শান্তা, এ গান হবে এই মাটির—শুধু ভালোবাসার। তুমি আমার হতে পারনি, আর আমিও তোমার হতে পারিনি, কিন্তু এই গান হবে আমাদের দুজনের। এ গান তোমার কাছে পৌঁছে যাবে—আর তোমার কণ্ঠে এ গান গুনগুন করে উঠবে, তোমার সন্তানরাও এ গান গাইবে। আর সারা দুনিয়াতে আমার এই ভালোবাসার গান গুঞ্জরিত হয়ে উঠবে—মানুষের মাঝে এক নতুন সাঁকো সৃষ্টি করবে।'

শান্তা তার আঁচল সামনে প্রসারিত করে নাজ হায়দারের কাছে প্রার্থনা করল, 'বেশ তুমি যাও, আর তোমার এই ফ্যাকাশে রঙ যেন তোমাকে সব সময় সুখী রাখে।'

বসিম বলল,

কেয়া ওহ্ নমরুদ কী খুদাই থী,
বন্দগী মেঁ মেরা ভলা ন হুয়া।

[সে কি নমরুদ (নমরুদ এক ভগবান-বিশ্বাসী বাদশাহ, যে

হজরত ইব্রাহিমকে আগুনে পুড়িয়ে মারে) বাদশাহ ছিল, যে উপাসনা ছাড়া, আমার কাছে আর কিছুই হয়ে উঠতে পারেনি]

নজহত বলল,

আএ হ্যায় বেকসিয়ে ইশক্ পে রোনা গালিব,

কিসকে ঘর জায়েগা সয়লাবে-বলা মেরে বাদ।

[হে গালিব, আমার পরবর্তী সময়ে প্রেম রসকষহীন হয়ে পড়বে। আর সেই নির্যাসহীন প্রেমের কথা মনে পড়তেই, আমার চোখ জলে ভরে উঠছে। মৃত্যুর পরে তো আমি কবরে শায়িত হব, কিন্তু এই নির্যাসহীন প্রেমের কি হবে ?]

নইম বলল,

দিল লগাকর লগ গয়া উনকো ভী তনহা বৈটনা,

হায় অপনী বেকসী কী পাই হম নে দাদ ইয়াঁ।

[কারও সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে ও একাকীত্বের জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছে। এই বিবশতা, এই নিষ্ঠুরতা যে কত বিরাট, তা মৃত্যুর আগেই অনুভব করলাম]

রিফ্‌ত বলল,

নফস ন অঞ্জমনে আরজু বাহর খ্যাঁচ,

অগর শরাব নহী ইনত্‌জারে সাগর খ্যাঁচ।

[ইচ্ছার যে মহফিল, সেই মহফিলে হাজির না হওয়ার কথা আমি কীভাবে ভাবতে পারি। যদি এই মহফিলে আমাকে মদিরা না দেওয়া হয়, তবে আমি মদিরার পেয়ালার জন্যে অপেক্ষা করব। একদিন তুমি নিজেই তা আমার হাতে তুলে দিবে।]

জমিল রিফ্‌তের রেশ ধরে বলল,

চলতা হুঁ থোড়ি দূর হর ইক তেজ রো কে সাথ,

পহচানতা নহী হুঁ অভী রাহবর কো মঁয়।

[আমি আমার মঞ্জিল আর আমার নেতাকে জানি না, যারা ছুটতে ছুটতে চলেছে—আমি তাদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে বেশ কিছুদূর এগিয়েছি]

অজন্তার যে পাহাড়ি আঁচল, সেই আঁচলের মাঝখানে এসে বাস থেমে গেল। এই পাহাড়ি-আঁচল থেকে ছোট্ট একটা রাস্তা ছোট্ট এক পাহাড়ি-ঘাঁটি চিরে সোজা অজন্তা গুহার দিকে চলে গিয়েছে। অজন্তার প্রথম গুহায় আমি বুদ্ধের এক বিরাট মূর্তি দেখলাম। এত বিরাট মূর্তি এলোরার অন্য কোন গুহাতে আমার চোখে পড়েনি। গাইড একটা ল্যাম্প জ্বালাল, আর সেই ল্যাম্পের আলোতে বুদ্ধ-মূর্তি আরও বেশী অনুভূতিময় হয়ে উঠল। এত জীবন্ত সেই বুদ্ধ-মূর্তি যে, তার চোখের যে পলক, তার ছায়া পর্যন্ত ভ্রম বলে মনে হচ্ছিল। গাইড ল্যাম্পটা মূর্তির অন্য পাশে নিয়ে গেল, আর সেই আলোতে মনে হতে লাগল বুদ্ধ-মূর্তি যেন হাসছে। এই হাসি যেন আশ্বাসের হাসি—যেন সারা বিশ্বের যে দুঃখ-কষ্ট তার জন্য উপলব্ধির মুচকি হাসি। সে সময় আমার মনে হচ্ছিল, যেন সমগ্র মানবতা তার ইতিহাসের এক-একটি পৃষ্ঠা আমার সামনে মেলে ধরছে। আর শতাব্দী যেন তার হৃদয় উন্মোচন করে আর্তনাদ করে চলেছে। বুদ্ধের প্রেমময় মিষ্টি হাসির মধ্যে যেন মানবতার এক অসাধারণ ব্যাখ্যা প্রস্ফূটিত হয়ে উঠছিল। যেন এই মুহূর্তে জলের বিন্দু সমুদ্রে পরিণত হচ্ছে, আর পরক্ষণেই যেন সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠছে। যেন কেউ আমার ওপর সৃষ্টির সমস্ত রহস্য এবং আন্তরিকতার সমস্ত সমাবেশ প্রকট করে তুলছিল। তুই মানুষ—তুই হাবশী তুই আরব ইহুদি আমেরিকান রাশিয়ান ভারতীয় ইরাণী জৈন—তোর রক্তের মধ্যে আছে গীতার উপদেশ, হজরত মহম্মদের কলমা, ঈশা মসিহার বিনম্রতা, বুদ্ধের শ্লোক, কবীরের দোহা, চিশতীর আত্মশ্লাঘা, নানকের উপদেশ। যেন তোর মধ্যে সমস্ত সভ্যতা নিহিত হয়ে আছে। কারণ তুই মানুষ। তুই সামনের দিকে এগিয়ে চলেছিস,—নিজের উত্তরাধিকারকে আগলে ধরে—নিজের ইতিহাসের পাতা উল্টোতে উল্টাতে। তুই ইতিহাসের নতুন পাতা রক্ত দিয়ে লিখতে লিখতে নতুন মানুষের দেহ সৃষ্টি করছিস, যে মানুষ পুরানো—প্রাচীন মানুষ থেকে উঠে আসছে। বুদ্ধের মধুর হাসির মধ্যে এসব কিছুই

যেন নিহিত ছিল। আর মন্ত্র মুগ্ধের মতো বুদ্ধ-মূর্তির সামনে সেই তিন-জন সুন্দর তরুণ-তরুণী, সেঠজী, সেঠজীর গোমস্তা এবং শিল্পী সবাই দাঁড়িয়েছিল। মানুষ নিজের থেকেই যেন সেই মহান হৃদয়ের কাছে মাথা নত করেছে, মাথা নত করে মহান সঙ্কল্পে বুক বেঁধেছে—আর তার অস্তিত্বকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

আমি বললাম, 'এই বুদ্ধের-মূর্তি নিশ্চয়ই কোন মহান শিল্পী সৃষ্টি করেছেন।'

গাইড বলল, 'দেখে মনে হয়, যেন শিল্পী কথা বলছেন।'

অজন্তাতে শুধু মাত্র এই একটি মূর্তিই ছিল না। বুদ্ধের অসংখ্য মূর্তি ছিল। আর সে-সব মূর্তিগুলিতে বুদ্ধের জীবনের সমস্ত ঘটনা চিত্রিত করা ছিল। হাজার হাজার বৎসরের এই প্রাচীন মূর্তিগুলিতে রঙ তেমনি জ্বলজ্বল করছিল। সত্যি অজন্তা দেখতে অসাধারণ সুন্দর—কল্পনার থেকেও সুন্দর! অজন্তাতে পাঁচ হাজার বৎসরের পুরানো শাড়ির যে নমুনা আজও বিদ্যমান, তার কাছে হাল আমলের শাড়ির নমুনা দাঁড়াতেই পারে না। রানীদের যে মহল, সেই মহল যেন পর্দা খাঁট সোফা সেট দিয়ে সাজনো-গোছানো। সেখানে একশ'র ওপর কেশ-বিন্যাসের চঙ অঙ্কিত করা আছে। সৌন্দর্যের সমস্ত কলা-কৌশল এই চিত্রগুলোতে বিন্যস্ত—আর সেই কলা-কৌশল 'ম্যাক্স ফেক্টরকেও চ্যালেঞ্জ করতে পারে। পুরুষ মানুষের পায়ের মোজা, দস্তান গলাবন্ধ স্পোর্টসের মতো ইংরেজি কোট ইত্যাদি—যা আমাদের ধারণা এসব ভারতবর্ষে ইংরেজরাই এনেছে, কিন্তু অজন্তার চিত্র-কলায় এসব কিছুই হাজার হাজার বছর আগেই চিত্রিত হয়ে আছে। শীশমহল অলঙ্কার ফানুস এবং ভোগ-বিলাসের সমস্ত রকম উপকরণই সেখানে রয়েছে। আর যেন সেই মহলে মানুষের চলা-ফেরার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। রাজারা মৃগয়া করছে। রানীরা সমস্ত রকম শৃঙ্গারের উপকরণ নিয়ে শৃঙ্গার করছে। আর মেয়েরা এত অসাধারণ সুন্দরী যে, অজন্তার গুহার বাইরে এত অজস্র সুন্দরী আর কোথাও দেখা যাবে না। কী সুন্দর সরু সরু অঙ্গুল আর টানা টানা চোখ।

কী সুন্দর সরু সরু কোমর। একমাত্র ভগবানই জানেন, সে যুগে মেয়েদের কীভাবে তৈরি করা হত! হয়তো সেই সৃষ্টির বীজ আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

বহুক্ষণ ধরে আমরা অজন্তার গুহা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। সুন্দর সৌম্য ছেলেরা সুন্দরী মেয়েদের কোমর জড়িয়ে ধরে তাদের কানে ফিস ফিস করে যেন প্রেমের কথা বলছে। আর অর্ধ নগ্ন মেয়েরা আড় চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে নীচে অজন্তা-নদীর দিকে এগুলাম। চারদিকে উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা—যেন অজন্তা এক অন্ধ পর্বতমালায় বন্দী হয়ে রয়েছে। নদীর জল যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। নদীর কিনারে বিরাট বিরাট রঙিন পাথর পড়ে রয়েছে। কোনটা হলদে কোনটা লাল কোনটা কালচে, কোনটা বা নারঙ্গী রঙের। এই পাথরের রঙ আর রঙের আভা দিয়ে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে অজন্তার গুহা-চিত্র আঁকা হয়েছে। এই সেই অজন্তা, যে অজন্তাকে আজ থেকে হাজার বৎসর আগে ভারতবর্ষের এক বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকে ধরে রাখা হয়েছে। কম করেও প্রায় বিশ-পঁচিশটি গুহা পাহাড়ের বুকের ওপর নিজেকে বিস্তৃত করে দিয়েছে। শেষ গুহার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। আর গুহাটির আয়তনও তেমন বড় নয়—ছোটই। এই গুহার চিত্রও অসম্পূর্ণ। পাথরের ওপর রেখা টানতে টানতে শিল্পী তা আর শেষ করেনি। দেখে মনে হচ্ছিল, এখনি বোধহয় কোন ভিক্ষু-শিল্পী আসবে। এসে অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে। কিন্তু কোন ভিক্ষুই এল না। ···নদী কুলকুল করে বয়ে চলেছে। দর্শকরা এক গুহা থেকে আর এক গুহায় যাচ্ছে। তারপর এক সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আর আকাশের চাঁদ অজন্তার ওপর এক ছাই রঙ বিছিয়ে দিল, অজন্তা ক্রমেই সেই ছায়ায় বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। আর এদিকে বাস সমানে হর্ন বাজিয়ে চলেছিল।

বাস অজন্তার চড়াইয়ের ওপর দিয়ে—অজন্তার গ্রাম ছাড়িয়ে

ছুটে চলল। রাস্তার ধারে কাপাস-তুলোর এক প্রসারিত খেত। সেই খেতে একজন কিসান, তার স্ত্রী মেয়ে আর ছেলে কাপাস ফুল তুলছে। খেতের পাশ দিয়ে যখন বাস ছুটে গেল, ওরা মুহূর্তের জন্যে কাপাসের ফুল তোলা বন্ধ করে থমকে দাঁড়াল। আর বিস্ময়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। কৃষকটির পরনে শুধু এক ফালি কাপড় ল্যাংগোটের মতো বাধা। ছোট্ট ছেলেটি একেবারে উলঙ্গ। তার স্ত্রী এবং মেয়েটি যদি মেয়ে না হত, তবে ওরাও হয়তো উলঙ্গই থাকত। ওদের পরনের কাপড়ও একেবারে জাল-জাল হয়ে গিয়েছে। কিসানের মেয়েটি খুব বিস্ময় এবং আগ্রহ নিয়ে বাসের সুন্দরী মেয়েদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। মেয়েটিও দেখতে কম সুন্দরী নয়। কিন্তু ও কোন দিন সুন্দর কাপড় পরেনি, কোন দিন স্নানাগার দেখেনি। কোন দিন পোলাও খায়নি। আর কোন দিন গালিবের কবিতা শোনেনি।

আমরা যখন অজান্তা দেখতে যাচ্ছিলাম, তখন রাস্তার ধারের এই কাপাসের খেতে তারা কাপাস-ফুল সংগ্রহ করে চলেছিল। ভোরের অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে ওরা তুলোর ফুল সংগ্রহের কাজে নামে, এখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমরা অজন্তা দেখে ফিরে যাচ্ছি। ওরা এখনও পর্যন্ত ফুল সংগ্রহ করে চলেছে।···ওদের পেছনে ফেলে বাস এগিয়ে চলল। আর ওরা আমাদের বাসের দিকে তাকিয়েই রইল। যেন ওদের চোখগুলি বলছে,—তোমরা অজন্তা দেখে ফিরে চলছে, কিন্তু তোমরা যখন অজন্তা দেখতে যাচ্ছ, তখনও ভোরের তারা জ্বল জ্বল করছিল, তখন আমি, আমার স্ত্রী আমার মেয়ে আর আমার ছোট্ট ছেলে—এই খেতে কাজ করছি। এখন তোমরা অজন্তা দেখে ফিরে যাচ্ছ, আর আমরা এখনও এই খেতে কাজ করে চলেছি। আমরা অজন্তাকে আজও পর্যন্ত দেখেনি। বহু বছর ধরে এই অজন্তার গ্রামে বাস করছি, অথচ আজ পর্যন্ত অজন্তা দেখেনি। কারণ অজন্তা তো গুহার মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে। বৌদ্ধরা অজন্তা গুহা তৈরি করে। আর হিন্দু রাজারা তাদের মহলে, মোগলরা তাদের হারেমে এবং মকরবে, ইংরেজরা তাদের বাংলোতে, আর তোমরা তোমাদের ঘরে আর ফ্ল্যাটে—এই ভাবে এই সুন্দর কোমল অজন্তা এক গুহা থেকে অন্য গুহায় পৌছে যাচ্ছে! এই সৌন্দর্য আর কোমলতাকে গুহার ভেতর থেকে টেনে বের করে নিয়ে এস—খেত খামার আর

কারখানার মধ্যে ছড়িয়ে দাও। অজন্তার উপাসক, অজন্তার মনিব, অজন্তার প্রেমিক এগিয়ে এস—এর মধ্যেই আছে তোমার জীবনের গতিময়তা,—এরই মধ্যে নিহিত আছে আমার প্রসন্নতা, এর মধ্যেই আছে মানবতার চরম উৎকর্ষতা। তুমি কি দেখেছ, অজন্তা গুহার মধ্যে অবস্থান করেও পাথুরে দেয়াল দিয়ে পরিবেষ্টিত হওয়া সত্বেও সে জীবন্ত থাকতে পারেনি। এ হচ্ছে হিন্দু অজন্তা মুসলিম অজন্তা আর পাশ্চাত্য অজন্তা! এস, আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক নতুন অজন্তা সৃষ্টি কর। যে নতুন অজন্তার ভিত্তিভূমি আমার খেতের মধ্যেই প্রসারিত। তাই এই অজন্তা অটুট—অমর, মৃত্যুহীন। সেই অর্ধ নগ্ন ব্রাহ্মণ অনেক—অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের বাসের দিকে তাকিয়ে ছিল। হয়তো ও এসব একটি কথাও বলেনি। হয়তো এসব কোন কথাই আমি শুনিনি। আমি শুধু ওর মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কারণ ও প্রসন্নতা আর অবাক চোখে বাসের সুন্দরী মেয়েদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল। ওর হাতে ছিল তুলোর সফেদ ফুল। আর ওর লজ্জায় অনবত চোখের দু তারায় ওর কুমারীত্ব স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আর ও যেন সেই তুলোর পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে কোন এক কল্পনার জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল—হারিয়ে ফেলে এক পৃথক সত্তা নিয়ে বহু—বহু দূর থেকে যেন সমানে হেসে চলেছিল। আমি ওকে দেখছিলাল, কিন্তু ও অনেক অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। ও আমার কথা শুনতে পাচ্ছিল না, আমিও ওকে বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু ওর সেই মিষ্টি মিষ্টি হাসি যেন আমাকে বলছিল, আমি শুধু মিষ্টি হাসি নই, আমি হচ্ছি উষার কিরণ। আমি সেই নতুন অজন্তার উষার কিরণ, যে অজন্তা এখনও তৈরি হয়নি—যে অজন্তা বহু—বহু দূরে। চলন্ত খেত আর খেতের ওপরে সে যেন দিগবলয়ে হেসে চলেছে।

বাসের যাত্রীরা নীরব। কারও মুখে কোন কথা নেই। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। নইম ধীরে ধীরে গুন গুন করে গেয়ে চলেছে :

ইক নিগারে আতিশে রূখ সর খুলা।

[আগুনের মতো জ্বলন্ত আদলের এক প্রেমিকা, যে এলোচুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে]